বিশাল ডানাওয়ালা এক থুরথুরে বুড়ো

গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ

বৃষ্টির তৃতীয় দিনে ওরা বাড়ির ভেতরে এতই কাঁকড়া মেরেছিল যে পেলাইওকে ভিজে-একশা উঠোন পেরিয়ে গিয়ে সেগুলোকে সমুদ্রে ছুড়ে ফেলে দিতে হয়েছিল, কারণ সারা রাত ধরে নবজাত শিশুটির ছিল জ্বর, আর ওরা ভেবেছিল জ্বরটা হয়েছে ওই পচা বদ গন্ধটার দরুন। মঙ্গলবার থেকেই সারা জগৎ কেমন বিষণ্ণ হয়ে আছে। সমুদ্র আর আকাশ হয়ে উঠেছে একটাই ছাই-ধূসর বস্তু; আর বেলাভূমির বালি, মার্চের রাত্তিরে যা ঝকঝক করে গুঁড়ো-গুঁড়ো আলোর মতো, হয়ে উঠেছে কাদা আর পচা খোলকমাছগুলোর এক ভাপে-সেদ্ধ-হওয়া দগদগে স্তূপ। দুপুরবেলাতেই আলো এমন দুর্বল যে পেলাইও যখন কাঁকড়াগুলোকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বাড়ি ফিরছিল, তার পক্ষে দেখাই মুশকিল ছিল উঠোনের পেছন কোণটায় কী-সেটা ছটফট করে নড়তে-নড়তে কাতরাচ্ছে। তাকে খুব কাছে গিয়ে তবেই দেখতে হয়েছিল যে এক বুড়ো, খুবই থুরথুরে বুড়ো, কাদার মধ্যে মুখ গুজে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে, আর তার প্রচণ্ড সব চেষ্টা সত্ত্বেও, কিছুতেই উঠতে পারছে না, তার বিশাল দুই ডানায় কেবলই বাধা পেয়ে যাচ্ছে।

সেই দুঃস্বপ্ন দেখে আঁতকে উঠে, পেলাইও ছুটে চলে গেল এলিসেন্দার কাছে, তার বউ, যে তখন অসুস্থ বাচ্চাটির কপালে জলপট্টি দিচ্ছিল, আর পেলাইও তাকে ডেকে নিয়ে গেল উঠোনের পেছন কোণায়। পড়ে-থাকা শরীরটার দিকে তাকিয়ে তারা কেমন হতভম্ব হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। বুড়োর পরনে ন্যাকড়াকুড়ুনির পোশাক। তার টাক-পড়া চকচকে মাথাটায় কয়েকটাই মাত্র বিবর্ণ চুল রয়েছে, ফোগলা মুখটায় খুবই কম দাঁত, আর এককালে যদি বা তার কোনো জাঁকজমক থেকেও থাকত এখন এই ঝোড়ো কাকের প্র-প্রপিতামহের করুণ দশা সে জাঁকজমক একেবারে উধাও করে দিয়েছে। তার অতিকায় শিকারি পাখির ডানা—নোংরা, আদ্ধেকটাই পালক খসা—চিরকালের মতো কাদায় জট পাকিয়ে গিয়েছে। ওরা তার দিকে এতক্ষণ ধরে খুব কাছে থেকে হাঁ করে তাকিয়েছিল যে পেলাইও আর এলিসেন্দা খানিক বাদেই তাদের প্রথম চমকটা জয় করে নিলে, বরং শেষটায় একে বেশ চেনা-চেনাই ঠেকল। তখনই সাহস করে তার সঙ্গে কথা কইবার একটা চেষ্টা করলে তারা, আর উত্তরে সে খালাশিদের যেমন গলা ফাটিয়ে কথা বলার অভ্যেস থাকে তেমনি রিনরিনে গলায় কী-এক দুর্বোধ্য বুলিতে জবাব দিলে। ওই কারণেই ওরা ডানাদুটোর ঝামেলা-টামেলাকে বেমালুম কোনো পাত্তা না দিয়েই বেশ বুদ্ধিধারীদের মতোই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাল যে সে নিশ্চয়ই তুফানে উলটে যাওয়া কোনো ভিনদেশি জাহাজের নিঃসঙ্গ ভরাডুবি নাবিক। অথচ তবু তাকে দেখাবার জন্যে ওরা এক পড়োশিনিকে ডেকে আনলে, সে আবার জীবনমৃত্যুর সব গলিঘুঁজিরই হদিস

রাখে; আর তার দিকে শুধু একবার তাকিয়েই সেই পড়োশিনির ওদের বোঝাতে দেরি হল না যে ওরা একটা মস্ত ভুল করেছে।

'এ যে এক দেবদূত', পড়োশিনি তাদের বললে। 'নিশ্চয়ই বাচ্চাকে নিয়ে যেতে আসছিল, কিন্তু বেচারা এমনই বুড়োহাবড়া যে এই মুষলবৃষ্টি তাকে একেবারে পেড়ে ফেলেছে।'

পরের দিনই সবাই জেনে গেল যে পেলাইওদের বাড়িতে এক রক্তমাংসের জ্যান্ত দেবদূতকে কয়েদ করে রাখা হয়েছে। জ্ঞানে ঝুনো ওই পড়োশিনির বিচারবুদ্ধিকে কোনো পাত্তা না দিয়ে—তার কাছে তখন দেবদূতমাত্রেই কোনো স্বর্গীয় ষড়যন্ত্রের পালিয়ে-বাঁচা নিদর্শন—ওরা তাকে মুগুরপেটা করে মেরে ফেলতে কোনো সায় পেলে না। রান্নাঘর থেকে পেলাইও সারা বিকেল তার ওপর নজর রাখলে, তাদের পালের খাটো মুগুরটায় সে সশস্ত্র; আর রাত্তিরে শুঁতে যাবার আগে তাকে সে কাদা থেকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে গিয়ে তারের জাল ঘেরা মুরগির খাঁচাটায় বন্ধ করে রাখলে। মাঝরাত্তিরে, বৃষ্টি যখন ধরে এল, পেলাইও আর এলিসেন্দা তখনও একটা পর একটা কাঁকড়া মারছে। একটু বাদেই বাচ্চাটাও জেগে উঠল মস্ত এক খাই-খাই নিয়ে, তার গায়ে আর জ্বর নেই। তখন ওরা একটু দরাজদিল হয়ে উঠল, ঠিক করলে যে এই দেবদূতকে ওরা তিনদিনের উপযোগী টাটকা জল আর খাবারদাবার দিয়ে একটা ভেলায় করে বারদরিয়ায় তার নিয়তির কাছে ছেড়ে দিয়ে আসবে। কিন্তু উষার প্রথম আলো ফোটবামাত্র যখন ওরা উঠোনে গিয়ে হাজির হল, ওরা দেখতে পেলে পুরো পাড়াটাই মুরগির খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে দেবদূতকে নিয়ে মজা করছে, রঙ্গতামাশা করছে, কারু মধ্যে কোনো সম্ভ্রমবোধ নেই, তারের মধ্যে দিয়ে তাকে ছুড়ে-ছুড়ে দিচ্ছে খাবার, যেন সে আদপেই কোনো অতিপ্রাকৃত জীব নয়—বরং যেন সে এক সার্কাসের জন্তু।

সকাল সাতটার আগেই পাদ্রে গোনসাগা এসে হাজির—এই অদ্ভুত খবরে বেশ শঙ্কিত হয়েই হন্তদন্ত হয়ে তিনি ছুটে এসেছেন। ততক্ষণে ভোরবেলাকার দর্শকদের মতো তত রঙবাজ নয় এমন দর্শকরা এসে হাজির হয়েছে, আর তারা বন্দীর ভবিষ্যৎ নিয়ে নানারকম জল্পনা-কল্পনা করতে শুরু করে দিয়েছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে সরল লোকটা ভেবে ফেলেছে যে একে সারা জগতের পুরপিতা নাম দেওয়া উচিত। অপেক্ষাকৃত কঠিন হৃদয়ের লোকেদের মনে হল একে এক পাঁচতারা সেনাপতির পদে উন্নীত করে দেওয়া হোক, যাতে সে সব যুদ্ধবিগ্রহই জিতিয়ে দিতে পারে। কিছু-কিছু দূরদর্শীর মনে হল তাকে দিয়ে যদি পৃথিবীতে কোনো ডানাওয়ালা জাতির জন্ম দেওয়ানো যায় তবে সে জাতি হবে জ্ঞানে-গুণে সবার সেরা, আর তারাই তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দায়িত্ব নিয়ে নেবে। কিন্তু পাদ্রে গোনসাগা, যাজক হবার আগে ছিলেন এক হট্টাকট্টা কাঠুরে—তারের বেড়ার পাশে দাড়িয়ে, তিনি মুহূর্তে জেরা করবার জন্যে প্রশ্নোত্তরে সব ভেবে নিলেন, আর ওদের বললেন দরজাটা খুলে দিতে, যাতে ভেতরে গিয়ে কাছে থেকে তিনি এই হতশ্রী করুণ লোকটাকে দেখে নিতে পারেন—যাকে তখন এই ভ্যাবাচাকা-খাওয়া মন্ত্রমুগ্ধ মুরগির ছানাগুলো মধ্যে এক অতিকায় জরাজীর্ণ মুরগির মতো দেখাচ্ছিল। সে শুয়ে আছে এক কোণায়, খোলা ডানাগুলো সে শুকোচ্ছে রোদ্দুরে, চারপাশে ছড়িয়ে আছে ফলের খোসা আর ছোটোহাজরির উচ্ছিষ্ট, ভোর ভোর ওঠা দর্শকরা এসে যেসব তাকে ছুড়ে দিয়েছে। পাদ্রে গোনসাগা যখন মুরগির খাঁচার মধ্যে ঢুকে পড়ে তাকে লাতিনে সুপ্রভাত জানালেন, জগতের ধৃষ্টতা আর ঔদ্ধত্য তার অচেনা

বলে সে শুধু তার প্রত্নপ্রাচীন চোখ তুলে গুনগুন করে কী একটা বললে তার ভাষায়। এ যে এক জোচ্চোর ফেরেববাজ, এবিষয়ে এ তল্লাটের যাজনপল্লির এই পুরুতটির মনে প্রথম সন্দেহটা দানা বেঁধে উঠল, বিশেষত যখন দেখতেই পেলেন যে এ ঈশ্বরের ভাষাই বোঝে না, কিংবা জানেও না কী করে ঈশ্বরের উজির-নাজিরদের সম্ভাষণ করতে হয়। তারপর তিনি খেয়াল করে দেখলেন যে খুব কাছে থেকে নজর করলে, তাকে বড্ড বেশি মানুষ মানুষ দেখায়। তার গা থেকে বেরোচ্ছে খোলামেলার এক অসহ্য গন্ধ, তার ডানাগুলোর পেছন দিকে গজিয়েছে নানারকম পরভৃৎ আর তার প্রধান পালকগুলোর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে পার্থিব সব হাওয়া; দেবদূতদের সগর্ব মর্যাদার সঙ্গে তুলনা করা যায় এমনকিছুই তার নেই। তারপর তিনি মুরগির খাঁচা থেকে বেরিয়ে এলেন এবং ছোট্ট একটি কথামৃত আউড়ে কৌতূহলীদের হুঁশিয়ার করে দিলেন ছলাকলাহীন সাদাসিধে অকপট লোক হবার ঝুঁকি কতটা; তিনি ওদের মনে করিয়ে দিলেন যে রোম্যান ক্যাথলিকদের হুল্লোড়ে উৎসবে এসে কৌশলে আচমকা ল্যাং মেরে দেবার একটা বিষম বদঅভ্যাস আছে শয়তানের—যাতে অসাবধানীদের সে বেকায়দায় ফেলে দিতে পারে, বিপথে নিয়ে যেতে পারে। তিনি যুক্তি দিয়ে বোঝালেন যে-কোনো ডানা যদি কোনো বাজপাখি আর উড়োজাহাজের তফাত নির্ধারণ করে নেবার কোনো আবশ্যিক উপাদান না হয়, তবে দেবদূতদের শনাক্ত করবার বেলায় ডানার গুরুত্ব তো আরোই কম। তৎসত্ত্বেও তিনি কথা দিলেন যে তিনি তাঁর বিশপকে একটি চিঠি দেবেন যাতে বিশপ তাঁর গির্জাশাসিত পল্লির আর্চবিশপকে লিখতে পারেন, আর তিনি তারপর লিখতে পারেন সর্বোচ্চ মোহান্তকে— যাতে উচ্চতম আদালত থেকে সর্বাধিনায়কের চূড়ান্ত রায়টি পাওয়া যায়।

তাঁর বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা—সকলই গিয়ে পড়ল বন্ধ্যা সব হৃদয়ে। বন্দি দেবদূতের খবর এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল যে কয়েকঘণ্টা বাদেই এক বড়ো হাটবাজারের ব্যস্ততা আর শোরগোল উঠল উঠোনে, আর ভিড়কে সরিয়ে দেবার জন্যে ডাকতে হলো সঙিনসমেত সেনাবাহিনীকে, নইলে বাড়িটা তারা প্রায় ধসিয়েই দিত। এই হাটবাজারের এত জঞ্জাল ঝাঁট দিয়ে দিয়ে এলিসেন্দার শিরদাঁড়া যেন দুমড়ে গিয়েছে; শেষটায় তার মাথায় খেলে গেল, আরে, উঠোনের চারপাশে বেড়া দিয়ে সকলের কাছ থেকেই তো দর্শনি বাবদ পাঁচ সেন্ট করে চাওয়া যায়।

কৌতূহলীরা এল দূর-দূরান্তর থেকে। এক ভ্রাম্যমান সার্কাস দলও এসে পৌঁছাল যার ছিল এক উড়ন্ত দড়বাজিকর, সে ভিড়ের ওপর বার কয় ভোঁ-ভোঁও করলে, কিন্তু কেউ তার দিকে কোনো পাত্তাই দিলে না—কারণ তার ডানাগুলো মোটেই কোনো দেবদূতের মতো ছিল না—বরং সেগুলোকে দেখাচ্ছিল কোনো নাক্ষত্র বাদুড়ের মতো। জগতের সবচেয়ে দুর্ভাগা ও অশক্তরা এল স্বাস্থ্যের সন্ধানে; এল এক বেচারি মেয়ে জন্ম থেকেই যে গুনে যাচ্ছিল তার বুকের ধুকধুক, গুনতে গুনতে এখন সে সব সংখ্যাই শেষ করে ফেলেছে; এল এক পোর্তুগিজ—কিছুতেই যে কখনও ঘুমোতে পারে না, কারণ তারাদের কোলাহল তার ঘুম কেবলই চটিয়ে দেয়; এল এক ঘুমে হাঁটা লোক, যে দিনে জেগে থাকা অবস্থায় যা-যা করেছে সব রাত্তিরে ঘুমের ঘোরে উঠে গুবলেট করে দেয়; এছাড়াও কত কত জন, তাদের অবশ্য অত ভয়াবহ সব অসুখ নেই। পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল যে জাহাজডুবির বিশৃঙ্খলা, তার মধ্যে পেলাইও আর এলিসেন্দা অবশ্য তাদের ক্লান্তিতেই সুখী, কারণ হপ্তা শেষ হবার আগেই তারা তাদের সবগুলো ঘর ঠেসেছে টাকাকড়িতে, আর

ভেতরে ঢোকবার পালা কখন আসে তার জন্যে যে তীর্থযাত্রীর সার অপেক্ষা করছে বাইরে, তা এমনকি দিগন্তও পেরিয়ে কোথায় চলে গিয়েছে।

এই দেবদূতই ছিল একমাত্র যে তার নিজের এই হুলস্থূল নাট্যে কোনোই ভূমিকা নেয়নি। তার এই ধার-করা নীড়ে কীভাবে সে একটু আরাম পাবে, তারই চেষ্টায় সে কাটায় সারা সময়—তেলের বাতি বা উপাসনার মোমবাতিগুলোর নারকীয় জ্বালায় আর উত্তাপে তার প্রায় মাথা খারাপ হবার জোগাড়, অথচ ওগুলো সারাক্ষণ ওই তারের খাঁচায় জ্বলছে। গোড়ায় তাকে ওরা ন্যাপথালিন খাওয়াবার চেষ্টা করেছিল, সেই পরমজ্ঞানী পড়োশিনির প্রজ্ঞা অনুযায়ী তাই নাকি দেবদূতের খাদ্য হিসেবে বিধানবিদিত। কিন্তু সে ওসব ফিরিয়ে দিয়েছে, যেমন সে ফিরিয়ে দিয়েছে পোপের ভোজ, পাপীতাপীরা প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যে মানত করে এসব ভূরিভোজ তার কাছে নিয়ে এসেছিল; আর তারা কখনও এটা বুঝে উঠতে পারেনি সে যে বেগুনভর্তা ছাড়া আর কিছুই খায় না, সে কি সে একজন দেবদূত বলে না কি ফোগলা দাঁতের এক বুড়ো থুরথুরে বলে। তবে একমাত্র অতিপ্রাকৃত শক্তি মনে হল তার ধৈর্য। বিশেষত প্রথম দিনগুলোয়, তার ডানায় যেসব নাক্ষত্র পরভৃৎ জম্পেশ করে গজিয়েছে তার খোঁজে যখন মুরগিরা তাকে ঠোকরাত, আর পঙ্গুরা ছিড়ে নিত তার পালক তাদের বিকল ঠুটো অঙ্গগুলোয় ছোঁয়াবার জন্যে, আর এমনকি যাদের প্রাণে সবচেয়ে দয়াধর্ম ছিল তারাও যখন তাকে তাগ করে ঢিল ছুড়ত যাতে সে উঠে পড়ে আর দাঁড়ালে তাকে কেমন দেখায় সেটা দেখবার জন্যে—তখনও সে শান্তই থাকত। একমাত্র যেবার তারা তাকে উসকে তাতিয়ে দিতে পেরেছিল সে তখনই যখন তারা তার পাশটা পুড়িয়ে ছিল তপ্ত লোহায়, যা দিয়ে ছ্যাঁকা লাগিয়ে তারা বলদের গায়ে মার্কা দিত—কারণ সে এতক্ষণ কেমন ঝিম মেরে নিশ্চল পড়েছিল যে তারা ভেবেছিল সে বুঝি মরেই গিয়েছে। আঁতকে জেগে উঠেছিল সে তখন, তার ওই রুদ্ধ দুর্বোধ্য অচেনা ভাষায় চেঁচিয়ে প্রলাপ বকেছিল, চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এসেছিল তার, আর সে তার ডানা ঝাপটেছিল বার দুই, যা মুরগির বিষ্ঠা আর চান্দ্র ধুলোর এক ঘূর্ণিহাওয়া তুলে দিয়েছিল, আর এমন একটা দমকা ঝাপটা তুলেছিল আতঙ্কের যাকে কিছুতেই এই জগতের বলে মনে হয়নি। যদিও অনেকে ভেবেছিল তার সাড়াটা ঠিক ক্রোধের নয়, বরং জ্বালার, ব্যথার। আর সেই থেকে তারা হুঁশিয়ার হয়ে যায় যাতে তাকে আর এমন চটিয়ে দেওয়া না হয়, কারণ বেশিরভাগ লোকই বুঝেছিল তার এই নিষ্ক্রিয় ঔদাস্য মোটেই কোনো বীরনায়কের বিশ্রাম নয়, বরং কোনো মহাপ্লাবনের পূর্বমুহূর্তের থমথমে ছমছমে ঘুম।

বাড়ির ঝি-চাকরানিদের প্রেরণা পাওয়া সব সূত্র দিয়েই পাদ্রে গোনসাগা ভিড়ের ছ্যাবলামিটা ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। বন্দির প্রকৃতি সম্বন্ধে চূড়ান্ত রায় কী আসে তারই জন্যে অপেক্ষা করছিলেন তিনি। কিন্তু রোম থেকে আসা চিঠিতে কোনো তাড়াই দেখা গেল না। তারা তাদের সময় কাটিয়ে দিলে এই সব প্রশ্নে—বন্দির কোনো নাভি আছে কি না, তার কথাবার্তার সঙ্গে সিরিয়াস প্রাচীন ভাষার কোনো সম্পর্ক আছে কি না, একটা ছুঁচের ডগায় তার মতো কটা মাথা এটে যায়, অথবা সে কি নিছকই নরওয়ের কোনো লোক, গায়ে ডানা লাগিয়ে নিয়েছে। ওই সব তুচ্ছ অতি সংক্ষিপ্ত চিঠিগুলো হয়তো সময়ের শেষ অব্দিই যাতায়াত করতে থাকত, যদি না এক দৈব ঘটনা পাদ্রে গোনসাগার সব নাজেহাল বিপত্তির একটা ইতি টেনে দিত।

ঘটেছিল কী, ওই দিনগুলোয়, আরো সব কত কত উৎসব মেলা আর সার্কাসের হরেকরকম বা আকর্ষণের মধ্যে, শহরে এসে পৌঁছেছিল একটি মেয়ের ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী, যে তার বাবা-মার কথার অবাধ্য হয়েছিল বলে মাকড়শা হয়ে গিয়েছে। দেবদূতকে দেখতে যত পয়সা দিতে হয়, একে দেখতে যেতে তার চেয়ে যে কম পয়সা দর্শনি বাবদ দিতে হয়, শুধু তাই নয়, তার এই অসম্ভব দশার জন্যে লোককে যা খুশি প্রশ্ন করবারও সুযোগ দেওয়া হয়, এমনকি তাকে আগাপাশতলা খুঁটিয়েও দেখতে দেওয়া হয় যাতে তার এই বিভীষিকার সত্য-মিথ্যা সম্বন্ধে কারো মনেই কোনো সন্দেহ না থাকে। সে এক ভয়ংকর তারানতুলা, একটা মস্ত ভেড়ার মতো বড়ো, আর তার মাথাটা এক বিষাদময়ী কুমারী মেয়ের। যা ছিল সবচেয়ে হৃদয় বিদারক, তা কিন্তু তার এই তাজ্জব আকৃতি নয়, বরং তার অকৃত্রিম দুঃখী করুণ গলা, যে গলায় সে তার দুর্ভাগ্যের সব খুঁটিনাটি বর্ণনা করত। যখন সে একেবারেই ছেলেমানুষ, এক নাচের আসরে যাবে বলে কাউকে কিছু না জানিয়ে সে তার বাবা-মার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল, আর অনুমতি না নিয়ে সারা রাত ধরে নাচবার পর সে যখন এক বনের মধ্যে দিয়ে ফিরছিল তখন হঠাৎ এক ভয়ংকর বজ্রপাত আকাশকে দু-ভাগে ফেড়ে দিয়েছিল আর ফাটলের মধ্য দিয়ে নেমে এসেছিল জ্বলন্ত গন্ধকের এক বিদ্যুৎশিখা যা তাকে বদলে দিয়েছিল এই আজব মাকড়শায়। যাদের প্রাণে দয়াদাক্ষিণ্য আছে তারা তার মুখে মাংসের বড়া ছুড়ে দেয়—একমাত্র তাই তাকে অ্যাদ্দিন ধরে বাঁচিয়ে রেখেছে। এরকম এক দৃশ্য, যার মধ্যে এতই মানবিক সত্য আর এমন এক ভয়ংকর শিক্ষা আছে, যে তা চেষ্টা না করেও হারিয়ে দিতে পারে কোনো উদ্ধত দেবদূতের প্রদর্শনী, যে দেবদূত কিনা ক্কচিৎ কখনও নাক সিটকে তাকায় মর্ত্যবাসীদের দিকে। তাছাড়া, দেবদূতের নামে যে কটা অলৌকিক অঘটনের দায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল তা শুধু এক ধরনের মানসিক বিশৃঙ্খলাই বোঝাচ্ছিল। যেমন— এক অন্ধ আতুর, সে তার দৃষ্টি ফিরে পায়নি বটে, তবে তার তিনটে নতুন দাঁত গজিয়ে গিয়েছিল; কিংবা এক পঙ্গু বেচারি যে হেঁটে হেঁটে গিরিলঙ্ঘন করতে পারেনি বটে তবে একটা লটারি প্রায় জিতেই যাচ্ছিল; কিংবা এক কুষ্ঠরোগী যার ঘাগুলো থেকে গজিয়েছিল সূর্যমুখী ফুল। কোনো সান্ত্বনা পুরস্কারের মতো এসব অলৌকিক কাণ্ড আসলে প্রায় বিসদৃশ সব মশকরা বা কৌতুকের মতোই—আর এ সবের ফলেই দেবদূতের মানসম্ভ্রম খ্যাতি ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছিল—তারপর মাকড়শায় বদলে যাওয়া মেয়েটি আসতেই তার সব নামডাক একেবারেই ধসে পড়ল। এইভাবেই পাদ্রে গোনসাগা তাঁর অনিদ্রা রোগ থেকে চিরকালের মতো রেহাই পেয়ে গেলেন আর পেলাইওদের উঠোন সেইরকমই ফাঁকা হয়ে গেল তিনদিন তিনরাত্তির যখন একটানা ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়েছিল আর কাঁকড়ারা হাঁটছিল তাদের শোবার ঘরে।

বাড়ির মালিকদের অবশ্য বিলাপ করার কোনোই কারণ ছিল না। যে টাকা তারা কামিয়েছিল তা দিয়ে তারা এক চকমেলানো দোতলা বাড়ি বানিয়ে নিলে, সে বাড়ির ছিল অলিন্দ আর বাগান আর উঁচু তারের জাল শীতের সময় যাতে কাঁকড়ারা আর ভেতরে ঢুকতে না পারে, আর জানালায় ছিল লোহার গরাদ যাতে কোনো পথহারা দেবদূতও ঢুকে পড়তে না পারে আচমকা। শহরের কাছেই পেলাইও একটা খরগোশ পালন করবার ঘিঞ্জি গোলকধাঁধা বানিয়ে নিলে, চিরকালের মতো ইস্তফা দিলে তারা সাধ্যপালের কাজে, আর এলিসেন্দা কিনে নিলে কতগুলো উঁচু ক্ষুরওয়ালা ঢাকা জুতো আর রামধনু-রঙা রেশমি কাপড়ের অনেক

প্রস্থ পোশাক, তখনকার দিনে রোববারে রোববারে যেসব পোশাক পরত সবচেয়ে অভিজাত ও কাঙ্ক্ষিত মহিলারা। যা যা তাদের কোনো মনোযোগ পায়নি, তার মধ্যে মুরগির খাঁচাটাই একমাত্র জিনিস ছিল না। যদি তারা রাসায়নিক দিয়ে তা ধুয়ে দিয়ে থাকে আর তার ভেতরে বারবার মস্তকির অশ্রু পুড়িয়ে থাকে, সে কিন্তু মোটেই এই দেবদূতের অর্চনায় নয়, বরং সেই গু-গোবরের স্তূপের দুর্গন্ধ তাড়িয়ে দিতেই—ভূতের মতো এখনও যা ঝুলে আছে সবখানে, আর নতুন দালানটাকে বানিয়ে দিচ্ছে পোড়োবাড়ি। গোড়ায়, যখন তাদের বাচ্চা হাঁটতে শিখল, তারা খুবই সাবধানে ছিল সে যাতে কখনও মুরগির খাঁচাটার খুব কাছে না যায়। কিন্তু তারপর তারা ক্রমে ক্রমে তাদের ভয় হারাতে শুরু করল, আর গন্ধটায় অভ্যস্ত হয়ে গেল। বাচ্চার দ্বিতীয় দাঁতটি বেরোবার আগেই সে মুরগির খাঁচার ভেতরে খেলতে চলে যেত, খাঁচার তারাগুলো ততদিনে অবহেলায় অযত্নে ছিঁড়ে ছিঁড়ে গিয়েছে। অন্য কোনো মর্ত্যবাসীর সঙ্গে কোনো মাখামাখিই করেনি দেবদূত, বরং দূরে দূরেই থাকত, এখনও সে তেমন একটা মাখামাখি করে না; তবে সব ভুল ধারণা হারিয়ে বসবার পর কোনো কুকুর যেমন বাচ্চাদের যাবতীয় যাচ্ছেতাই অপমান ও নিগ্রহ পরম ধৈর্যভরে সহ্য করে, তেমনি ধৈর্যের সঙ্গে দেবদূত এই বাচ্চাটিকে সহ্য করত। একই সঙ্গে দুজনকেই পেড়ে ফেলল জলবসন্ত। যে ডাক্তার বাচ্চাটির রোগ দেখতে এসেছিল সে অবশ্য দেবদূতের হৃৎপিণ্ডের ধুকপুক শোনবার লোভ সামলাতে পারলে না, আর সে তার বুকে এত শিস শুনতে পেলে আর এতই শোরগোল শুনতে পেলে তার বৃক্কে যে তার পক্ষে বেঁচে থাকাই সম্ভব বলে ডাক্তারের মনে হল না। যেটা তাকে সবচেয়ে তাক লাগিয়ে দিলে সেটা এই ডানা দুটোর যুক্তি ও প্রকৃতি। এ দুটি এমনই স্বাভাবিক যে পুরোপুরি কোনো মানুষেরই আবশ্যিক অঙ্গ বলে মনে হয়, আর তার অবাক লাগল এই ভেবে যে অন্য মানুষদেরই বা কোনো ডানা নেই কেন।

বাচ্চা যখন স্কুলে যাওয়া শুরু করল, সেটা রোদে বৃষ্টিতে মুরগির খাঁচার সম্পূর্ণ ধ্বংসের কিছুকাল পরে। দেবদূত এখন এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়, পথহারা দিকভোলা কোনো মুমূর্ষের মতো। ওরা তাকে ঝাঁটা মেরে বার করে দেয় শোবার ঘর থেকে, কিন্তু পরক্ষণেই তাকে দ্যাখে রান্নাঘরে, একই সঙ্গে তাকে এত বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় বলে মনে হয় যে তারা অবাক হয়ে ভাবে এর আবার আরো কতগুলো সংস্করণ হয়ে গেল নাকি—সে কি নিজেকেই তৈরি করছে বাড়ির সকল কোণায়খামচিতে? আর বিপর্যস্ত ও তিতিবিরক্ত এলিসেন্দা ডুকরে গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে বলতে লাগল দেবদূতে দেবদূতে থই থই করা কোনো নরকে বাস করা কী যে জঘন্য কাণ্ড ! দেবদূত এখন খেতেই পারে না কিছু, তার প্রত্নপ্রাচীন চোখও এখন এত ঘোলাটে হয়ে গেছে যে সবসময়ে সে জিনিসপত্তরে ধাক্কা খায়। তার শেষ পালকগুলোর নিছক সূক্ষ্ম জালের মতো দাঁড়গুলোই এখন আছে তার। পেলাইও একটা কম্বল ছুড়ে দেয় তার ওপর, তাকে করুণা করে একটা আটচালার নীচে শুতে দেয়। আর শুধু তখনই তারা আবিষ্কার করলে যে রোজ রাত্তিরে তার জ্বর আসে, আর কোনো বুড়ো নরওয়েবাসীর জিভজড়ানো ভাষায় সে বিকারের ঘোরে প্রলাপ বকে। যে কয়েকবার তারা বিষম ভয় পেয়ে গিয়েছিল, এ তারই একটা, কারণ তারা ধরেই নিয়েছিল যে এ বুঝি মরতে বসেছে, আর তাদের জ্ঞানীগুণী পড়োশিনি অব্দি তাদের বলতে পারলে না কোনো মরা দেবদূতকে নিয়ে তারা কী করবে।

অথচ তবু যে সে তার সবচেয়ে জঘন্য শীতকালটাই টিকে গেল তাই নয়, প্রথম রোদ্দুরে ভরা দিনগুলো আসতেই মনে হল সে ক্রমেই সেরে উঠছে। উঠোনের সবচেয়ে দূর কোণায় সে কয়েকদিন নিশ্চল পড়ে

থাকে, যেখানে কেউই তাকে দেখতে পায় না; আর ডিসেম্বরের গোড়ায় তার ডানায় মস্ত কতগুলো আড় ধরা পালক গজিয়ে ওঠে, কোনো কাকতাড়ুয়ার পালক যেন সেগুলো, তার জরার আরেকটা দুর্ভাগা লক্ষণ বলেই মনে হল এই পালকগুলোকে। কিন্তু সে নিজে নিশ্চয়ই জানতে পেরেছিল এসব বদলের আসল কারণ, কেন-না কেউ যাতে তা না দেখতে পায় এবিষয়ে সে খুবই সজাগ ছিল, সে খুবই সাবধান ছিল কেউ যাতে শুনতে না পায় আকাশভরা ঝিকিমিকি তারার তলায় সে যখন সিন্ধুরোলের গান গুনগুন করে। একদিন সকালে এলিসেন্দা যখন পেঁয়াজকলির গুচ্ছ কাটছে, তখন আচমকা মনে হল হঠাৎ যেন দূর বারদরিয়ার এক ঝলক হাওয়া এসে ঢুকেছে রান্নাঘরে। তখন সে জানালায় গিয়ে দেখতে পেলে দেবদূত এই প্রথম তার ডানা ছড়িয়ে ওড়বার চেষ্টা করছে। কিন্তু এমনই অগোছালো ও অনভ্যস্ত তার এ অপচেষ্টা যে তার নখগুলো সবজিবাগানের মধ্যে গভীর সব খাঁজ কেটে দিচ্ছে। আর সে হয়তো তার জবুথবু উলটোপালটা ডানা ঝাপটানিতে আটচালাটাও ধসিয়ে দিত, বিশেষত বারে বারে সে যেরকম হড়কে যাচ্ছিল, কিছুতেই আঁটো করে চেপে ধরতে পারছিল না হাওয়া। তবু অবশ্য কেমন নড়বড়েভাবে সে একটু উঠতে পারল ওপরে। এলিসেন্দা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে—নিজের জন্যে স্বস্তি আর দেবদূতের জন্যেও স্বস্তি—যখন সে দেখতে পেলে যে দেবদূত এখন শেষ বাড়িগুলোর ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে, কোনোরকমে সে নিজেকে ধরে রেখেছে উড়ালটায়, কোনো মতিচ্ছন্ন জরাগ্রস্ত শকুনের ঝুঁকিতে ভরা ডানাঝাপটানি দিয়ে। পেঁয়াজ কাটা সারা হয়ে যাবার পরও এলিসেন্দা তাকে দেখতেই থাকে তাকিয়ে। দেখতেই থাকে যখন তাকে আর দেখাই সম্ভব ছিল না—কারণ সে তো আর তখন তার জীবনের কোনো উৎপাত বা জ্বালাতন নয়, বরং সমুদ্রের দিকচক্রবালে নিছকই কাল্পনিক একটা ফুটকিই যেন।

অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ (১৯২৭-২০১৪) : জন্ম দক্ষিণ আমেরিকার কলম্বিয়ার আরকাটাকায়। দীর্ঘদিন সাংবাদিক হিসেবে দক্ষিণ আমেরিকার ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে কাটান। মূলত ঔপন্যাসিক হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন। গদ্য সাহিত্যে ‘জাদু বাস্তবতা’ ধারার তিনিই প্রধান প্রবক্তা। একশো বছরের নিঃসঙ্গতা, কলেরার দিনগুলিতে প্রেম, কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না, চিলিতে গোপনে, বিপন্ন এক নাবিকের গল্প, এই শহরে কোন চোর নেই প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত রচনা। ১৯৮২ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পান। তাঁর জাদু বাস্তবতা ধারার পাঠ্য এই ছোটোগল্পটি ‘এই শহরে কোন চোর নেই’ থেকে নেওয়া হয়েছে।

ভারতীয় কবিতা

শিক্ষার সার্কাস

আইয়াপ্পা পানিকর

তুমি যদি প্রথম শ্রেণিতে পাস করো?
আমি দ্বিতীয় শ্রেণিতে যেতে পারি।
তুমি যদি দ্বিতীয় শ্রেণিতে পাস করো?
যদি আমি দ্বিতীয় শ্রেণি পাস করি,
বেশ, আমি সোজা তৃতীয় শ্রেণিতে যেতে পারি।
তুমি যদি তৃতীয় শ্রেণিও পাস করো?

বেশ, আমি তৃতীয় শ্রেণিও পাস করি, বেশ তাহলে,
এক, দুই, তিন..... চার!
তাহলে আমি চতুর্থ শ্রেণিতে বসতে পারি।

তুমি যদি এই সবগুলো শ্রেণি পাস করো?
যদি সব শ্রেণি শেষ হয়ে যায়,
আমি তবু পরের শ্রেণিতে যাব।

সব শিক্ষা একটি সার্কাস
যার সাহায্যে আমরা পরের শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হই।
জ্ঞান কোথায় গেল?
সে যেখানে গেছে, সেটা ধোঁকা!

অনুবাদ : উৎপলকুমার বসু

আইয়াপ্পা পানিকর (১৯৩০-২০০৬) : জন্ম কেরালার কোভালামে। মালয়ালম কাব্য সাহিত্যে আধুনিক যুগ সৃষ্টিতে আইয়াপ্পা পানিকরের অবদান স্মরণীয়। তিনি ছিলেন একই সঙ্গে প্রাবন্ধিক ও সাহিত্য সমালোচক। বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। ১৯৬০-এ প্রকাশিত তাঁর কাব্যগ্রন্থ ‘কুরুক্ষেত্রম’ মালয়ালম কাব্যসাহিত্যের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : *আইয়াপ্পা পানিক্করুদে কৃতিকল* ও *চিন্তা*।

পূর্ণাঙ্গ
সহায়ক গ্রন্থ

গুরু

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

অচলায়তন

একদল বালক

প্রথম। ওরে ভাই শুনেছিস?

দ্বিতীয়। শুনেছি — কিন্তু চুপ কর।

তৃতীয়। কেন বল দেখি?

দ্বিতীয়। কী জানি বললে যদি অপরাধ হয়?

প্রথম। কিন্তু উপাধ্যায়মশায় নিজে যে আমাকে বলেছেন।

তৃতীয়। কী বলেছেন বল না।

প্রথম। গুরু আসছেন।

তৃতীয়। ভয় করছে না ভাই?

দ্বিতীয়। ভয় করছে।

প্রথম। আমার ভয় করছে না, মনে হচ্ছে মজা।

তৃতীয়। কিন্তু ভাই গুরু কী?

দ্বিতীয়। তা জানি নে।

তৃতীয়। কে জানে?

দ্বিতীয়। এখানে কেউ জানে না।

প্রথম। শুনেছি গুরু খুব বড়ো, খুব মস্ত বড়ো।

তৃতীয়। তা হলে এখানে কোথায় ধরবে?

প্রথম। পঞ্চকদাদা বলেন অচলায়তনে তাঁকে কোথাও ধরবে না।

তৃতীয়। কোথাও না?

প্রথম। কোথাও না।

তৃতীয়। তা হলে কী হবে?

প্রথম। ভারি মজা হবে।

[প্রস্থান

পঞ্চকের প্রবেশ

পঞ্চক।

গান

তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে কেউ তা জানে না।
আমার মন যে কাঁদে আপন মনে কেউ তা মানে না।
ওরে ভাই, কে আছিস ভাই। কাকে ডেকে বলব, গুরু আসছেন।

সঞ্জীবের প্রবেশ

সঞ্জীব। তাই তো শুনেছি। কিন্তু কে এসে খবর দিলে বলো তো।

পঞ্চক। কে দিলে তা তো কেউ বলে না।

সঞ্জীব। কিন্তু গুরু আসছেন বলে তুমি তো তৈরি হচ্ছ না পঞ্চক?

পঞ্চক। বাঃ, সেইজন্যেই তো পুঁথিপত্র সব ফেলে দিয়েছি।

সঞ্জীব। সেই বুঝি তোমার তৈরি হওয়া?

পঞ্চক। আরে, গুরু যখন না থাকেন তখনই পুঁথিপত্র। গুরু যখন আসবেন তখন ওই সব জঞ্জাল সরিয়ে দিয়ে সময় খোলসা করতে হবে। আমি সেই পুঁথি বন্ধ করবার কাজে ভয়ানক ব্যস্ত।

সঞ্জীব। তাই তো দেখছি।

[প্রস্থান

পঞ্চক।

গান

ফিরি আমি উদাস প্রাণে, তাকাই সবার মুখের পানে,
তোমার মতো এমন টানে কেউ তো টানে না।

ওহে জয়োত্তম, তুমি কাঁধে কীসের বোঝা নিয়ে চলেছ? বোঝা ফেলো। গুরু আসছেন যে।

জয়োত্তম। আরে ছুঁয়ো না; এ সব মাঙ্গল্য। গুরুর জন্যে সিংহদ্বার সাজাতে চলেছি।

পঞ্চক। গুরু কোন দ্বার দিয়ে ঢুকবেন তা জানবে কী করে?

জয়োত্তম। তা তো বটেই। অচলায়তনে জানবার লোক কেবল তুমিই আছ।

পঞ্চক। তোমরাও জানো না, আমিও জানিনে — তফাতটা এই যে, তোমরা বোঝা বয়ে মরো, আমি হালকা হয়ে বসে আছি।

জয়োত্তম। আচ্ছা, এখন পথ ছাড়ো, আমার সময় নেই।

[প্রস্থান

পঞ্চক।

গান

বেজে ওঠে পঞ্চমে স্বর, কেঁপে ওঠে বন্ধ এ ঘর,
বাহির হতে দুয়ারে কর কেউ তো হানে না।

মহাপঞ্চকের প্রবেশ

মহাপঞ্চক। গান! অচলায়তনে গান! মতিভ্রম হয়েছে!

পঞ্চক। এবার দাদা, স্বয়ং তোমাকেও গান ধরতে হবে। একধার থেকে মতিভ্রমের পালা আরম্ভ হল।

মহাপঞ্চক। আমি মহাপঞ্চক, গান ধরব! ঠাট্টা আমার সঙ্গে!

পঞ্চক। ঠাট্টা নয়। অচলায়তনে এবার মন্ত্র ঘুচে গান আরম্ভ হবে। এই বোবা পাথরগুলো থেকে সুর বেরোবে।

মহাপঞ্চক। কেন বলো তো?

পঞ্চক। গুরু আসছেন যে! তাই আমার কেবলই মন্তরে ভুল হচ্ছে।

মহাপঞ্চক। গুরু এলে তোমার জন্যে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারব না।

পঞ্চক। তার জন্য ভাবনা কী? নির্লজ্জ হয়ে একলা আমিই মুখ দেখাব।

মহাপঞ্চক। মন্তরে ভুল হলে গুরু তোমাকে আয়তন থেকে দূর করে দেবেন।

পঞ্চক। সেই ভরসাতেই তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে আছি।

মহাপঞ্চক। অমিতায়ুর্ধারণী মন্ত্রটা —

পঞ্চক। সেই মন্ত্রটা স্বয়ং গুরুর কাছ থেকে শিখব বলেই তো আগাগোড়া ভোলবার চেষ্টায় আছি। সেইজন্যেই গান ধরেছি দাদা।

মহাপঞ্চক। ওই শঙ্খ বাজল। এখন আমার সপ্তমকুমারিকা গাথা পাঠের সময়। কিন্তু বলে যাচ্ছি, সময় নষ্ট কোরো না। গুরু আসছেন।

পঞ্চক।

গান

আকাশে কার ব্যাকুলতা, বাতাস বহে কার বারতা,
এ পথে সেই গোপন কথা কেউ তো আনে না।।

ও কী ও! কান্না শুনি যে! এ নিশ্চয়ই সুভদ্র। আমাদের এই অচলায়তনে ওই বালকের চোখের জল আর শুকোল না। ওর কান্না আমি সইতে পারিনে।

[প্রস্থান ও বালক সুভদ্রকে লইয়া পুনঃপ্রবেশ

পঞ্চক। তোর কোনো ভয় নেই ভাই, কোনো ভয় নেই। তুই আমার কাছে বল — কী হয়েছে বল।

সুভদ্র। আমি পাপ করেছি।

পঞ্চক। পাপ করেছিস? কী পাপ?

সুভদ্র। সে আমি বলতে পারব না। ভয়ানক পাপ। আমার কী হবে?

পঞ্চক। তোর সব পাপ আমি কেড়ে নেব, তুই বল।

সুভদ্র। আমি আমাদের আয়তনের উত্তর দিকের —

পঞ্চক। উত্তর দিকের?

সুভদ্র। হাঁ, উত্তর দিকের জানলা খুলে—

পঞ্চক। জানালা খুলে কী করলি?

সুভদ্র। বাইরেটা দেখে ফেলেছি।

পঞ্চক। দেখে ফেলেছিস? শুনে লোভ হচ্ছে যে।

সুভদ্র। হাঁ পঞ্চকদাদা। কিন্তু বেশিক্ষণ না — একবার দেখেই তখনই বন্ধ করে ফেলেছি। কোন প্রায়শ্চিত্ত করলে আমার পাপ যাবে?

পঞ্চক। ভুলে গেছি ভাই। প্রায়শ্চিত্ত বিশ-পঁচিশ হাজার রকম আছে; আমি যদি এই আয়তনে না আসতুম তা হলে তার বারো-আনাই কেবল পুঁথিতে লেখা থাকত — আমি আসার পর প্রায় তার সবকটাই ব্যবহারে লাগাতে পেরেছি, কিন্তু মনে রাখতে পারিনি।

বালকদলের প্রবেশ

প্রথম। অ্যাঁ, সুভদ্র! তুমি বুঝি এখানে!

দ্বিতীয়। জান পঞ্চকদাদা, সুভদ্র কী ভয়ানক পাপ করেছে?

পঞ্চক। চুপ চুপ! ভয় নেই, সুভদ্র, কাঁদছিস কেন ভাই? প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় তো করবি। প্রায়শ্চিত্ত করতে ভারি মজা। এখানে রোজই একঘেয়ে রকমের দিন কাটে, প্রায়শ্চিত্ত না থাকলে তো মানুষ টিকতেই পারত না।

প্রথম। (চুপিচুপি) জান পঞ্চকদাদা, সুভদ্র উত্তর দিকের জানলা—

পঞ্চক। আচ্ছা, আচ্ছা, সুভদ্রের মতো তোদের অত সাহস আছে?

দ্বিতীয়। আমাদের আয়তনের উত্তর দিকটা যে একজটা দেবীর!

তৃতীয়। সেদিক থেকে আমাদের আয়তনে যদি একটুও হাওয়া ঢোকে তাহলে যে সে —

পঞ্চক। তা হলে কী?

তৃতীয়। সে যে ভয়ানক।

পঞ্চক। কী ভয়ানক শুনিই না।

তৃতীয়। জানি নে, কিন্তু সে ভয়ানক।

সুভদ্র। পঞ্চকদাদা, আমি আর কখনো খুলব না পঞ্চকদাদা। আমার কী হবে?

পঞ্চক। শোন বলি সুভদ্র, কীসে কী হয় আমি ভাই কিছুই জানিনে — কিন্তু যাই হোক না, আমি তাতে একটুও ভয় করি নে।

সুভদ্র। ভয় করো না?

সকল ছেলে। ভয় করো না?

পঞ্চক। না। আমি তো বলি, দেখিই না কী হয়।

সকলে। (কাছে ঘেঁষিয়া) আচ্ছা দাদা, তুমি বুঝি অনেক দেখেছ?

পঞ্চক। দেখেছি বইকি। ও মাসে শনিবারে যেদিন মহাময়ূরী দেবীর পূজা পড়ল, সেদিন আমি কাঁসার থালায় ইঁদুরের গর্তের মাটি রেখে, তার উপর পাঁচটা শেয়ালকাঁটার পাতা আর তিনটে মাষকলাই সাজিয়ে নিজে আঠারো বার ফুঁ দিয়েছি।

সকলে। অ্যাঁ! কী ভয়ানক! আঠারো বার!

সুভদ্র। পঞ্চকদাদা, তোমার কী হল?

পঞ্চক। তিনদিনের দিন যে সাপটা এসে আমাকে নিশ্চয় কামড়াবে কথা ছিল, সে আজ পর্যন্ত আমাকে খুঁজে বের করতে পারেনি।

প্রথম। কিন্তু ভয়ানক পাপ করেছ তুমি।

দ্বিতীয়। মহাময়ূরী দেবী ভয়ানক রাগ করেছেন।

পঞ্চক। তার রাগটা কী রকম সেইটে দেখবার জন্যেই তো একাজ করেছি!

সুভদ্র। কিন্তু পঞ্চকদাদা, যদি তোমাকে সাপে কামড়াত!

পঞ্চক। তা হলে মাথা থেকে পা পর্যন্ত কোথাও কোনো সন্দেহ থাকত না — ভাই সুভদ্র, জানলা খুলে তুই কী দেখলি বল দেখি।

দ্বিতীয়। না, না বলিসনে।

তৃতীয়। না, সে আমরা শুনতে পারব না — কী ভয়ানক!

প্রথম। আচ্ছা, একটু — খুব একটুখানি বল ভাই।

সুভদ্র। আমি দেখলুম সেখানে পাহাড়, গোরু চরছে —

বালকগণ। (কানে আঙুল দিয়া) ও বাবা, না না, আর শুনব না। আর বোলো না সুভদ্র। ওই যে উপাধ্যায়মশাই আসছেন। চল চল — আর না।

পঞ্চক। কেন? এখন তোমাদের কী?

প্রথম। বেশ, তাও জান না বুঝি? আজ যে পূর্বফাল্গুনী নক্ষত্র —

পঞ্চক। তাতে কী?

দ্বিতীয়। আজ কাকিনী সরোবরের নৈর্ঋত কোণে ঢোঁড়া সাপের খোলস খুঁজতে হবে না?

পঞ্চক। কেন রে?

প্রথম। তুমি কিছু জান না পঞ্চকদাদা। সেই খোলস কালো রঙের ঘোড়ার লেজের সাতগাছি চুল দিয়ে বেঁধে পুড়িয়ে ধোঁয়া করতে হবে যে।

দ্বিতীয়। আজ যে পিতৃপুরুষেরা সেই ধোঁয়া ঘ্রাণ করতে আসবেন।

পঞ্চক। তাতে তাঁদের কষ্ট হবে না?

প্রথম। পুণ্য হবে যে, ভয়ানক পুণ্য।

[সুভদ্র ব্যতীত বালকগণের প্রস্থান

উপাধ্যায়ের প্রবেশ

সুভদ্র। উপাধ্যায়মশায়!

পঞ্চক। আরে পালা পালা। উপাধ্যায়মশায়ের কাছ থেকে একটু পরমার্থতত্ত্ব শুনতে হবে, এখন বিরক্তি করিস নে, একেবারে দৌড়ে পালা।

উপাধ্যায়। কী সুভদ্র, তোমার বক্তব্য কী শীঘ্র বলে যাও।

সুভদ্র। আমি ভয়ানক পাপ করেছি।

পঞ্চক। ভারি পণ্ডিত কিনা। পাপ করেছি! পালা বলছি।

উপাধ্যায়। (উৎসাহিত হইয়া) পাপ করেছ? ওকে তাড়া দিচ্ছ কেন? সুভদ্র, শুনে যাও।

পঞ্চক। আর রক্ষা নেই, পাপের এতটুকু গন্ধ পেলে একেবারে মাছির মতো ছোটে।

উপাধ্যায়। কী বলছিলে?

সুভদ্র। আমি পাপ করেছি।

উপাধ্যায়। পাপ করেছ? আচ্ছা বেশ। তা হলে বোসো। শোনা যাক।

সুভদ্র। আমি আয়তনের উত্তর দিকের —

উপাধ্যায়। বলো, বলো, উত্তর দিকের দেয়ালে আঁক কেটেছ?

সুভদ্র। না, আমি উত্তর দিকের জানলায় —

উপাধ্যায়। বুঝেছি, কুনুই ঠেকিয়েছ। তাহলে তো সেদিকে আমাদের যতগুলি যজ্ঞের পাত্র আছে সমস্তই ফেলা যাবে। সাত মাসের বাছুরকে দিয়ে ওই জানলা না চাটাতে পারলে শোধন হবে না।

পঞ্চক। এটা আপনি ভুল বলছেন। ক্রিয়াসংগ্রহে আছে, ভূমিকুষ্মাণ্ডের বোঁটা দিয়ে একবার —

উপাধ্যায়। তোমার তো স্পর্ধা কম দেখি নে। কুলদত্তের ক্রিয়াসংগ্রহের অষ্টাদশ অধ্যায়টি কি কোনোদিন খুলে দেখা হয়েছে?

পঞ্চক। (জনান্তিকে) সুভদ্র, যাও তুমি। — কিন্তু কুলদত্তকে তো আমি —

উপাধ্যায়। কুলদত্তকে মানো না? আচ্ছা, ভরদ্বাজ মিশ্রের প্রয়োগপ্রজ্ঞপ্তি তো মানতেই হবে — তাতে —

সুভদ্র। উপাধ্যায়মশায়, আমি ভয়ানক পাপ করেছি।

পঞ্চক। আবার! সেই কথাই তো হচ্ছে। তুই চুপ কর।

উপাধ্যায়। সুভদ্র, উত্তরের দেয়ালে যে আঁক কেটেছ সে চতুষ্কোণ, না গোলাকার?

সুভদ্র। আঁক কাটিনি। আমি জানলা খুলে বাইরে চেয়েছিলুম।

উপাধ্যায়। (বসিয়া পড়িয়া) আঃ সর্বনাশ! করেছিস কী? আজ তিনশো পঁয়তাল্লিশ বছর ওই জানলা কেউ খোলেনি তা জানিস?

সুভদ্র। আমার কী হবে?

পঞ্চক। (সুভদ্রকে আলিঙ্গন করিয়া) তোমার জয়জয়কার হবে সুভদ্র। তিনশো পঁয়তাল্লিশ বছরের আগল তুমি ঘুচিয়েছ। তোমার এই অসামান্য সাহস দেখে উপাধ্যায়মশায়ের মুখে আর কথা নেই। গুরু আসার পথ তুমিই প্রথম খোলসা করে দিলে।

[প্রস্থান

আচার্য ও উপাচার্যের প্রবেশ

আচার্য। এতকাল পরে আমাদের গুরু আসছেন।

উপাচার্য। তিনি প্রসন্ন হয়েছেন।

আচার্য। প্রসন্ন হয়েছেন? তা হবে। হয়তো প্রসন্নই হয়েছেন। কিন্তু কেমন করে জানব?

উপাচার্য। নইলে তিনি আসবেন কেন?

আচার্য। এক-এক সময়ে মনে ভয় হয় যে, হয়তো অপরাধের মাত্রা পূর্ণ হয়েছে বলেই তিনি আসছেন।

উপাচার্য। না আচার্যদেব, এমন কথা বলবেন না। আমরা কঠোর নিয়ম সমস্তই নিঃশেষে পালন করেছি — কোনো ত্রুটি ঘটেনি।

আচার্য। কঠোর নিয়ম? হাঁ সমস্তই পালিত হয়েছে।

উপাচার্য। ব্রজশুদ্ধিব্রত আমাদের আয়তনে এইবার নিয়ে ঠিক সাতাত্তরবার পূর্ণ হয়েছে। আর কোনো আয়তনে এ কি সম্ভবপর হয়!

আচার্য। না, আর কোথাও হতে পারে না।

উপাচার্য। কিন্তু তবু আপনার মনে এমন দ্বিধা হচ্ছে কেন?

আচার্য। সূতসোম, তোমার মনে কি তুমি শান্তি পেয়েছ?

উপাচার্য। আমার তো এক মুহূর্তের জন্যে অশান্তি নেই।

আচার্য। অশান্তি নেই?

উপাচার্য। কিছুমাত্র না। আমার অহোরাত্র একেবারে নিয়ম বাঁধা। এর চেয়ে আর শান্তি কী হতে পারে?

আচার্য। ঠিক, ঠিক — ঠিক বলেছ সূতসোম। অচেনার মধ্যে গিয়ে কোথায় তার অন্ত পাব? এখানে সমস্তই জানা, সমস্তই অভ্যস্ত — এখানকার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এখানকারই সমস্ত শাস্ত্রের ভিতর থেকে

পাওয়া যায় — তার জন্যে একটুও বাইরে যাবার দরকার হয় না। এই তো নিশ্চল শান্তি!

উপাচার্য। আচার্যদেব, আপনাকে এমন বিচলিত হতে কখনো দেখিনি।

আচার্য। কী জানি, আমার কেমন মনে হচ্ছে, কেবল একলা আমিই না, চারিদিকে সমস্তই বিচলিত হয়ে উঠছে। আমার মনে হচ্ছে, আমাদের এখানকার দেয়ালের প্রত্যেক পাথরটা পর্যন্ত বিচলিত। তুমি এটা অনুভব করতে পারছ না সূতসোম?

উপাচার্য। কিছুমাত্র না। এখানকার অটল স্তব্ধতার লেশমাত্র বিচ্যুতি দেখতে পাচ্ছিনে। আমাদের তো বিচলিত হবার কথাও না। আমাদের সমস্ত শিক্ষা কোন কালে সমাধা হয়ে গেছে। আমাদের সমস্ত লাভ সমাপ্ত, সমস্ত সঞ্চয় পর্যাপ্ত। ওই যে পঞ্চক আসছে। পাথরের মধ্যে কি ঘাস বেরোয়? এমন ছেলে আমাদের আয়তনে কী করে সম্ভব হল। ওই আমাদের দুর্লক্ষণ। এই আয়তনের মধ্যে ও কেবল আপনাকেই মানে। আপনি ওকে একটু ভর্ৎসনা করে দেবেন।

আচার্য। আচ্ছা তুমি যাও। আমি ওর সঙ্গে একটু নিভৃতে কথা কয়ে দেখি।

[উপাচার্যের প্রস্থান

পঞ্চকের প্রবেশ

আচার্য। (পঞ্চকের গায়ে হাত দিয়া) বৎস পঞ্চক!

পঞ্চক। করলেন কী! আমাকে ছুঁলেন?

আচার্য। কেন, বাধা কী আছে?

পঞ্চক। আমি যে আচার রক্ষা করতে পারিনি।

আচার্য। কেন পারোনি বৎস?

পঞ্চক। প্রভু, কেন, তা আমি বলতে পারিনে। আমার পারবার উপায় নেই।

আচার্য। সৌম্য, তুমি যে জানো, এখানকার যে নিময় সেই নিয়মকে আশ্রয় করে হাজার বছর হাজার হাজার লোক নিশ্চিন্ত আছে। আমরা যে খুশি তাকে কি ভাঙতে পারি?

পঞ্চক। আচার্যদেব, যে নিয়ম সত্য তাকে ভাঙতে না দিলে তার যে পরীক্ষা হয় না। তাই কি ঠিক নয়?

আচার্য। যাও বৎস, তোমার পথে তুমি যাও। আমাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা কোরো না।

পঞ্চক। আচার্যদেব, আপনি জানেন না কিন্তু আপনিই আমাকে নিয়মের চাকার নীচে থেকে টেনে নিয়েছেন।

আচার্য। কেমন করে বৎস?

পঞ্চক। তা জানি নে, কিন্তু আপনি আমাকে এমন একটা কিছু দিয়েছেন যা আচারের চেয়ে, নিয়মের চেয়ে অনেক বেশি।

আচার্য। তুমি কী করো না-করো আমি কোনোদিন জিজ্ঞাসা করিনে, কিন্তু আজ একটি কথা জিজ্ঞাসা করব। তুমি কি অচলায়তনের বাইরে গিয়ে যূনক জাতির সঙ্গে মেশো?

পঞ্চক। আপনি কি এর উত্তর শুনতে চান?

আচার্য। না না থাক, বোলো না। কিন্তু যূনকেরা যে অত্যন্ত ম্লেচ্ছ। তাদের সহবাস কি —

পঞ্চক। তাদের সম্বন্ধে আপনার কি কোনো বিশেষ আদেশ আছে?

আচার্য। না না, আদেশ আমার কিছুই নেই। যদি ভুল করতে হয় তবে ভুল করো গে — তুমি ভুল করো গে — আমাদের কথা শুনো না!

পঞ্চক। ওই উপাচার্য আসছেন — বোধ করি কাজের কথা আছে — বিদায় হই।

[প্রস্থান

উপাধ্যায় ও উপাচার্যের প্রবেশ

উপাচার্য। (উপাধ্যায়ের প্রতি) আচার্যদেবকে তো বলতেই হবে। উনি নিতান্ত উদবিগ্ন হবেন — কিন্তু দায়িত্ব যে ওঁরই।

আচার্য। উপাধ্যায়, কোনো সংবাদ আছে নাকি?

উপাধ্যায়। অত্যন্ত মন্দ সংবাদ।

আচার্য। অতএব সেটা সত্বর বলা উচিত।

উপাধ্যায়। আচার্যদেব, সুভদ্র আমাদের আয়তনের উত্তর দিকের জানলা খুলে বাইরে দৃষ্টিপাত করেছে।

আচার্য। উত্তর দিকটা তো একজটা দেবীর।

উপাধ্যায়। সেই তো ভাবনা। আমাদের আয়তনের মন্ত্রপূত রুদ্ধ বাতাসকে সেখানকার হাওয়া কতটা দূর পর্যন্ত আক্রমণ করেছে বলা তো যায় না।

উপাচার্য। এখন কথা হচ্ছে, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কী।

আচার্য। আমার তো স্মরণ হয় না। উপাধ্যায় বোধ করি—

উপাধ্যায়। না, আমিও তো মনে আনতে পারিনে। আজ তিনশো বছর এ প্রায়শ্চিত্তটার প্রয়োজন হয়নি — সবাই ভুলেই গেছে। ওই যে মহাপঞ্চক আসছে — যদি কারও জানা থাকে তো সে ওর।

মহাপঞ্চকের প্রবেশ

উপাধ্যায়। মহাপঞ্চক, সব শুনেছ বোধ করি।

মহাপঞ্চক। সেইজন্যেই তো এলুম; আমরা এখন সকলেই অশুচি, বাহিরের হাওয়া আমাদের আয়তনে প্রবেশ করেছে।

উপাচার্য। এর প্রায়শ্চিত্ত কী, আমাদের কারও স্মরণ নেই। তুমিই হয়তো বলতে পারো।

মহাপঞ্চক। ক্রিয়াকল্পতরুতে এর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না — একমাত্র ভগবান জ্বলনানন্তকৃত আধিকর্মিক বর্ষায়ণে লিখছে, অপরাধীকে ছয়মাস মহাতামস সাধন করতে হবে।

উপাচার্য। মহাতামস?

মহাপঞ্চক। হাঁ, ওকে অন্ধকারে রেখে দিতে হবে, আলোকের এক রশ্মিমাত্রও দেখতে পাবে না। কেন-না, আলোকের দ্বারা যে অপরাধ অন্ধকারের দ্বারাই তার ক্ষালন।

উপাচার্য। তা হলে, মহাপঞ্চক, সমস্ত ভার তোমার উপর রইল।

উপাধ্যায়। চলো আমিও তোমার সঙ্গে যাই। ততক্ষণ সুভদ্রকে হিঙ্গুমর্দনকুণ্ডে স্নান করিয়ে আনি গে।

[সকলের গমনোদ্যম

আচার্য। শোনো, প্রয়োজন নেই।

উপাধ্যায়। কীসের প্রয়োজন নেই?

আচার্য। প্রায়শ্চিত্তের।

মহাপঞ্চক। প্রয়োজন নেই বলছেন! আধিকর্মিক বর্ষায়ণ খুলে আমি এখনই দেখিয়ে দিচ্ছি —

আচার্য। দরকার নেই — সুভদ্রকে কোনো প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না, আমি আশীর্বাদ করে তার —

মহাপঞ্চক। এও কি কখনো সম্ভব হয়? যা কোনো শাস্ত্রে লেখা নেই আপনি কি তাই —

আচার্য। না, হতে দেব না, যদি কোনো অপরাধ ঘটে সে আমার। তোমাদের ভয় নেই।

উপাধ্যায়। এরকম দুর্বলতা তো আপনার কোনোদিন দেখিনি! এই তো সেবার অষ্টাঙ্গশুদ্ধি উপবাসে তৃতীয় রাত্রে বালক কুশলশীল জল জল করে পিপাসায় প্রাণত্যাগ করলে কিন্তু তবু তার মুখে যখন এক বিন্দু জল দেওয়া গেল না, তখন তো আপনি নীরব হয়েছিলেন। তুচ্ছ মানুষের প্রাণ আজ আছে কাল নেই, কিন্তু সনাতন ধর্মবিধি তো চিরকালের।

সুভদ্রকে লইয়া পঞ্চকের প্রবেশ

পঞ্চক। ভয় নেই সুভদ্র, তোর কোনো ভয় নেই — এই শিশুটিকে অভয় দাও প্রভু।

আচার্য। বৎস, তুমি কোনো পাপ করোনি। যারা বিনা অপরাধে তোমাকে হাজার হাজার বৎসর ধরে মুখ বিকৃত করে ভয় দেখাচ্ছে, পাপ তাদেরই। এসো পঞ্চক।

[সুভদ্রকে কোলে লইয়া পঞ্চকের সঙ্গে প্রস্থান

উপাধ্যায়। এ কী হল উপাচার্যমশায়?

[উপাচার্যের প্রস্থান

মহাপঞ্চক। আমরা অশুচি হয়ে রইলুম, আমাদের যাগযজ্ঞ ব্রত উপবাসে সকলই পণ্ড হতে থাকল, এ তো সহ্য করা শক্ত।

উপাধ্যায়। এ সহ্য করা চলবেই না। আচার্য কী শেষে আমাদের ম্লেচ্ছের সঙ্গে সমান করে দিতে চান?

মহাপঞ্চক। উনি আজ সুভদ্রকে বাঁচাতে গিয়ে সনাতন ধর্মকে বিনাশ করবেন। এ কী রকম বুদ্ধিবিকার ওঁর ঘটল! এ অবস্থায় ওঁকে আচার্য বলে গণ্য করাই চলবে না।

সঞ্জীব, বিশ্বম্ভর, জয়োত্তমের প্রবেশ

সঞ্জীব। এতদিন এখানে সব ঠিক চলছিল। যেই গুরু আসবেন রব উঠল অমনি কেন এইসব অনাচার ঘটতে লাগল?

বিশ্বম্ভর। আচার্য অদীনপুণ্য যদি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করেন, তবে তিনি যেরকম আছেন থাকুন কিন্তু আমরা তাঁর কোনো অনুশাসন মানব না।

জয়োত্তম। তিনি বলেন, তাঁর গুরু তাঁকে যে আসনে বসিয়েছেন তাঁর গুরুই তাঁকে সেই আসন থেকে নামিয়ে দেবেন, সেইজন্য তিনি অপেক্ষা করেছেন।

অধ্যেতার প্রবেশ

উপাধ্যায়। কী গো অধ্যেতা, ব্যাপার কী?

অধ্যেতা। সুভদ্রকে মহাতামসে বসায় কার সাধ্য?

মহাপঞ্চক। কেন কী বিঘ্ন ঘটেছে?

অধ্যেতা। মূর্তিমান বিঘ্ন রয়েছে তোমার ভাই।

মহাপঞ্চক। পঞ্চক?

অধ্যেতা। হাঁ। আমি ডাকতেই সুভদ্র ছুটে এল, কিন্তু পঞ্চক তাকে কেড়ে নিয়ে গেল।

মহাপঞ্চক। না, এই নরাধমকে নিয়ে আর চলল না। অনেক সহ্য করেছি। এবার ওকে নির্বাসন দেওয়াই স্থির। কিন্তু অধ্যেতা, তুমি এটা সহ্য করলে?

অধ্যেতা। আমি কি তোমার পঞ্চককে ভয় করি? স্বয়ং আচার্য অদীনপুণ্য এসে তাকে আদেশ করলেন, তাই তো সে সাহস পেলে।

সঞ্জীব। স্বয়ং আমাদের আচার্য!

বিশ্বম্ভর। ক্রমে এসব হচ্ছে কী! এতদিন এই আয়তনে আছি, কখনো তো এমন অনাচারের কথা শুনিনি। আর স্বয়ং আমাদের আচার্যের এই কীর্তি!

জয়োত্তম। তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করেই দেখা যাক না।

বিশ্বম্ভর। না না, আচার্যকে আমরা —

মহাপঞ্চক। কী করবে আচার্যকে, বলেই ফেলো।

বিশ্বম্ভর। তাই তো ভাবছি কী করা যায়। তাঁকে না হয় — আপনি বলে দিন না কী করতে হবে।

মহাপঞ্চক। আমি বলছি তাঁকে সংযত করে রাখতে হবে।

সঞ্জীব। কেমন করে?

মহাপঞ্চক। কেমন করে আবার কী? মত্ত হস্তীকে যেমন করে সংযত করতে হয় তেমনি করে।

জয়োত্তম। আমাদের আচার্যদেবকে কী তা হলে —

মহাপঞ্চক। হাঁ, তাঁকে বন্ধ রাখতে হবে। চুপ করে রইলে যে! পারবে না?

আচার্যের প্রবেশ

আচার্য। বৎস, এতদিন তোমরা আমাকে আচার্য বলে মেনেছ, আজ তোমাদের সামনে আমার বিচারের দিন এসেছে। আমি স্বীকার করছি অপরাধের অন্ত নেই, তার প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করতে হবে।

সঞ্জীব। তবে আর দেরি করেন কেন? এদিকে যে আমাদের সর্বনাশ হয়।

আচার্য। গুরু চলে গেলেন, আমরা তাঁর জায়গায় পুঁথি নিয়ে বসলুম; সেই জীর্ণ পুঁথির ভাণ্ডারে প্রতিদিন তোমরা দলে দলে আমার কাছে তোমাদের তরুণ হৃদয়টি মেলে ধরে কী চাইতে এসেছিলে? অমৃতবাণী? কিন্তু আমার তালু যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। রসনায় যে রসের লেশমাত্র নেই। এবার নিয়ে এসো সেই বাণী, গুরু, নিয়ে এসো হৃদয়ের বাণী। প্রাণকে প্রাণ দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে যাও।

পঞ্চক। (ছুটিয়া প্রবেশ করিয়া) তোমার নববর্ষার সজল হাওয়ায় উড়ে যাক সব শুকনো পাতা — আয় রে নবীন কিশলয় — তোরা ছুটে আয়, তোরা ফুটে বেরো। ভাই জয়োত্তম, শুনছ না, আকাশের ঘননীল মেঘের মধ্যে মুক্তির ডাক উঠেছে — আজ নৃত্য করো রে নৃত্য করো।

গান

ওরে ওরে ওরে আমার মন মেতেছে,
তারে আজ থামায় কে রে।
সে যে আকাশ পানে হাত পেতেছে,
তারে আজ নামায় কে রে।

প্রথমে জয়োত্তমের, পরে বিশ্বম্ভরের, পরে সঞ্জীবের নৃত্যগীতে যোগ

মহাপঞ্চক। পঞ্চক, নির্লজ্জ বানর কোথাকার, থাম বলছি থাম।

পঞ্চক।

গান

ওরে আমার মন মেতেছে
আমারে মাথায় কে রে।

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, আমি তোমাকে বলিনি একজটা দেবীর শাপ আরম্ভ হয়েছে? দেখছ, কী করে তিনি আমাদের সকলের বুদ্ধিকে বিচলিত করে তুলছেন — ক্রমে দেখবে অচলায়তনের একটি পাথরও আর থাকবে না।

পঞ্চক। না, থাকবে না, থাকবে না, পাথরগুলো সব পাগল হয়ে যাবে; তারা কে কোথায় ছুটে বেরিয়ে পড়বে, তারা গান ধরবে —

ওরে ভাই, নাচ রে, ও ভাই, নাচ রে —
আজ ছাড়া পেয়ে বাঁচ রে, —
লাজভয় ঘুচিয়ে দে রে;
তোরে আজ থামায় কে রে!

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কী। সর্বনাশ শুরু হয়েছে, বুঝতে পারছ না। ওরে সব ছন্নমতি মূর্খ, অভিশপ্ত বর্বর, আজ তোদের নাচবার দিন?

পঞ্চক। সর্বনাশের বাজনা বাজলেই নাচ শুরু হয় দাদা।

মহাপঞ্চক। চুপ কর লক্ষ্মীছাড়া! ছাত্রগণ, তোমরা আত্মবিস্মৃত হোয়ো না। ঘোর বিপদ আসন্ন, সে কথা স্মরণ রেখো।

বিশ্বম্ভর। আচার্যদেব, পায়ে ধরি, সুভদ্রকে আমাদের হাতে দিন, তাকে তার প্রায়শ্চিত্ত থেকে নিরস্ত করবেন না।

আচার্য। না বৎস, এমন অনুরোধ কোরো না।

সঞ্জীব। ভেবে দেখুন, সুভদ্রের কতবড়ো ভাগ্য। মহাতামস কজন লোকে পারে। ও যে ধরাতলে দেবত্ব লাভ করবে!

আচার্য। গায়ের জোরে দেবতা গড়বার পাপে আমাকে লিপ্ত কোরো না। সে মানুষ, সে শিশু, সেইজন্যেই সে দেবতাদের প্রিয়।

জয়োত্তম। দেখুন, আপনি আমাদের আচার্য, আমাদের প্রণম্য, কিন্তু যে অন্যায় কাজ করছেন, তাতে আমরা বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য হব।

আচার্য। করো, বলপ্রয়োগ করো, আমাকে মেনো না, আমাকে মারো, আমি অপমানেরই যোগ্য, তোমাদের হাত দিয়ে আমার যে শাস্তি আরম্ভ হল, তাতেই বুঝতে পারছি গুরুর আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু সেইজন্যেই বলছি শাস্তির কারণ আর বাড়তে দেব না। সুভদ্রকে তোমাদের হাতে দিতে পারব না।

বিশ্বম্ভর। পারবেন না?

আচার্য। না।

মহাপঞ্চক। তা হলে আর দ্বিধা করা নয়। বিশ্বম্ভর, এখন তোমাদের উচিত ওঁকে জোর করে ধরে নিয়ে ঘরে বন্ধ করা। ভীরু, কেউ সাহস করছ না? আমাকেই তবে একাজ করতে হবে?

জয়োত্তম। খবরদার — আচার্যদেবের গায়ে হাত দিতে পারবে না।

বিশ্বম্ভর। না না, মহাপঞ্চক, ওঁকে অপমান করলে আমরা সইতে পারব না।

সঞ্জীব। আমরা সকলে মিলে পায়ে ধরে ওঁকে রাজি করাব। একা সুভদ্রের প্রতি দয়া করে উনি কী আমাদের সকলের অমঙ্গল ঘটাবেন?

বিশ্বম্ভর। এই অচলায়তনের এমন কত শিশু উপবাসে প্রাণত্যাগ করেছে — তাতে ক্ষতি কী হয়েছে?

সুভদ্রের প্রবেশ

সুভদ্র। আমাকে মহাতামস ব্রত করাও।

পঞ্চক। সর্বনাশ করলে! ঘুমিয়ে পড়েছে দেখে আমি এখানে এসেছিলুম কখন জেগে উঠে চলে এসেছে।

আচার্য। বৎস সুভদ্র, এসো আমার কোলে। যাকে পাপ বলে ভয় করছ সে পাপ আমার — আমিই প্রায়শ্চিত্ত করব।

বিশ্বম্ভর। না না, আয়রে আয় সুভদ্র, তুই মানুষ না, দুই দেবতা।

সঞ্জীব। তুই ধন্য।

বিশ্বম্ভর। তোর বয়সে মহাতামস করা আর কারও ভাগ্যে ঘটেনি। সার্থক তোর মা তোকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন।

উপাধ্যায়। আহা সুভদ্র, তুই আমাদের অচলায়তনেরই বালক বটে।

মহাপঞ্চক। আচার্য, এখনো কী তুমি জোর করে এই বালককে এই মহাপুণ্য থেকে বঞ্চিত করতে চাচ্ছ?

আচার্য। হায় হায়, এই দেখেই তো আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তোমরা যদি ওকে কাঁদিয়ে আমার হাত থেকে ছিঁড়ে কেড়ে নিয়ে যেতে তা হলেও আমার এত বেদনা হত না। কিন্তু দেখছি হাজার বছরের নিষ্ঠুর মুষ্টি অতটুকু শিশুর মনকেও চেপে ধরেছে, একেবারে পাঁচ আঙুলের দাগ বসিয়ে দিয়েছে রে! কখন সময় পেল সে? সে কি গর্ভের মধ্যেও কাজ করে?

পঞ্চক। সুভদ্র, আয় ভাই, প্রায়শ্চিত্ত করতে যাই — আমিও যাব তোর সঙ্গে।

আচার্য। বৎস, আমিও যাব।

সুভদ্র। না না, আমাকে যে একলা থাকতে হবে — লোক থাকলে যে পাপ হবে।

মহাপঞ্চক। ধন্য শিশু, তুমি তোমার ওই প্রাচীন আচার্যকে আজ শিক্ষা দিলে! এসো তুমি আমার সঙ্গে।

আচার্য। না, আমি যতক্ষণ তোমাদের আচার্য আছি ততক্ষণ আমার আদেশ ব্যতীত কোনো ব্রত আরম্ভ বা শেষ হতেই পারে না। আমি নিষেধ করছি। সুভদ্র, আচার্যের কথা অমান্য করো না — এসো পঞ্চক, ওকে কোলে করে নিয়ে এসো।

[সুভদ্রকে লইয়া পঞ্চকের ও আচার্যের এবং উপাধ্যায়ের প্রস্থান

মহাপঞ্চক। ধিক্! তোমাদের মতো ভীরুদের দুর্গতি হতে রক্ষা করে এমন সাধ্য কারও নেই। তোমরা নিজেও মরবে, অন্য সকলকে মারবে।

পদাতিকের প্রবেশ

পদাতিক। স্থবিরপত্তনের রাজা আসছেন।

মহাপঞ্চক। ব্যাপারখানা কী! এ যে আমাদের রাজা মন্থরগুপ্ত!

রাজার প্রবেশ

রাজা। নরদেবগণ, তোমাদের সকলকে নমস্কার।

সকলে। জয়োস্তু রাজন্।

মহাপঞ্চক। কুশল তো?

রাজা। অত্যন্ত মন্দ সংবাদ। প্রত্যন্তদেশের দূতেরা এসে খবর দিল যে, দাদাঠাকুরের দল এসে আমাদের রাজ্যসীমার কাছে বাসা বেঁধেছে।

মহাপঞ্চক। দাদাঠাকুরের দল কারা?

রাজা। ওই যে যূনকরা।

মহাপঞ্চক। যূনকরা যদি একবার আমাদের প্রাচীর ভাঙে তাহলে যে সমস্ত লণ্ডভণ্ড করে দেবে!

রাজা। সেইজন্যেই তো ছুটে এলুম। চণ্ডক বলে একজন যূনক আমাদের স্থবিরক সম্প্রদায়ের মন্ত্র পাবার জন্যে গোপনে তপস্যা করছিল। আমি সংবাদ পেয়েই তার শিরশ্ছেদ করেছি।

মহাপঞ্চক। ভালোই করেছেন। কিন্তু এ দিকে অচলায়তনের মধ্যেই যে পাপ প্রবেশ করেছে তার কী করলেন? আমাদের পরাভবের আর দেরি কী?

রাজা। সে কী কথা!

সঞ্জীব। আয়তনে একজটা দেবীর শাপ লেগেছে।

রাজা। একজটা দেবীর শাপ! সর্বনাশ! কেন তাঁর শাপ?

মহাপঞ্চক। যে উত্তর দিকে তাঁর অধিষ্ঠান এখানে একদিন সেই দিককার জানলা খোলা হয়েছে।

রাজা। (বসিয়া পড়িয়া) তবে তো আর আশা নেই।

মহাপঞ্চক। আচার্য অদীনপুণ্য এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দিচ্ছেন না।

বিশ্বম্ভর। তিনি জোর করে আমাদের ঠেকিয়ে রেখেছেন।

রাজা। দাও, দাও, অদীনপুণ্যকে এখনই নির্বাসিত করে দাও!

মহাপঞ্চক। আগামী অমাবস্যায় —

রাজা। না না, এখন তিথিনক্ষত্র দেখবার সময় নেই। বিপদ আসন্ন। সংকটের সময় আমি আমার রাজ-অধিকার খাটাতে পারি — শাস্ত্রে তার বিধান আছে।

মহাপঞ্চক। হাঁ আছে। কিন্তু আচার্য কে হবে?

রাজা। তুমি, তুমি। এখনই আমি তোমাকে আচার্যের পদে প্রতিষ্ঠিত করে দিলুম। দিক্‌পালগণ সাক্ষী, এই ব্রহ্মচারীগণ সাক্ষী।

মহাপঞ্চক। অদীনপুণ্যকে কোথায় নির্বাসিত করতে চান?

রাজা। আয়তনের বাইরে নয়। কী জানি যদি যূনকদের সঙ্গে যোগ দেন। আয়তনের প্রান্তে যে দর্ভকপাড়া আছে সেইখানে তাঁকে বন্ধ করে রেখো।

জয়োত্তম। আচার্য অদীনপুণ্যকে দর্ভকদের পাড়ায়! তারা যে অন্ত্যজজাতি — অশুচি পতিত।

মহাপঞ্চক। যিনি স্পর্ধাপূর্বক আচার লঙ্ঘন করেন, অনাচারীদের মধ্যে নির্বাসনই তাঁর উচিত দণ্ড। মনে কোরো না আমার ভাই বলে পঞ্চককে ক্ষমা করব। তারও সেই দর্ভকপাড়ায় গতি।

দূতের প্রবেশ

দূত। শুনলুম গুরু খুব কাছে এসেছেন।

রাজা। কে বললে?

দূত। চারিদিকেই কথা উঠেছে।

রাজা। তাহলে তো তাঁর অভ্যর্থনার আয়োজন করতে হবে। মহাপঞ্চক, অচলায়তনের সমস্ত জানলা বন্ধ করে শুদ্ধিমন্ত্র পাঠ করতে থাকো।

মহাপঞ্চক। জানলা বন্ধ সম্বন্ধে ভাববেন না। মন্ত্রের ভার আমি নিচ্ছি।

[রাজার প্রস্থান

পঞ্চক কোথায়?

জয়োত্তম। শুনলাম সে প্রাচীর ডিঙিয়ে যূনকদের কাছে গেছে।

মহাপঞ্চক। পাষণ্ড! আর যেন সে আয়তনে ফিরে না আসে। গুরু আসবার আগেই এখানকার সমস্ত উপদ্রব দূর করা চাই। ওহে ব্রহ্মচারিগণ, মন্ত্র পড়বার জন্যে স্নান করে প্রস্তুত হয়ে এসো।

২

পাহাড় মাঠ

পঞ্চকের গান

এ পথ গেছে কোনখানে গো কোনখানে —
তা কে জানে তা কে জানে।
কোন পাহাড়ের পারে, কোন সাগরের ধারে,
কোন দুরাশার দিকপানে —
তা কে জানে তা কে জানে।
এ পথ দিয়ে কে আসে যায় কোনখানে
তা কে জানে তা কে জানে।
কেমন তার বাণী, কেমন হাসিখানি,
যায় সে কাহার সন্ধানে
তা কে জানে তা কে জানে।

পশ্চাতে আসিয়া যূনকদলের নৃত্য

পঞ্চক। ও কী রে! তোরা কখন পিছনে এসে নাচতে লেগেছিলি?

প্রথম যূনক। আমরা নাচবার সুযোগ পেলেই নাচি, পা দুটোকে স্থির রাখতে পারিনে।

দ্বিতীয় যূনক। আয় ভাই, ওকে সুদ্ধ কাঁধে করে নিয়ে একবার নাচি।

পঞ্চক। আরে না না, আমাকে ছুঁস নে রে, ছুঁসনে।

তৃতীয় যূনক। ওই রে! ওকে অচলায়তনের ভূতে পেয়েছে। যূনককে ছোঁবে না।

পঞ্চক। জানিস, আমাদের গুরু আসবেন?

প্রথম যূনক। সত্যি নাকি? তিনি মানুষটি কী রকম? তাঁর মধ্যে নতুন কিছু আছে?

পঞ্চক। নতুনও আছে, পুরোনোও আছে।

দ্বিতীয় যূনক। আচ্ছা, এলে খবর দিয়ো — একবার দেখব তাঁকে।

পঞ্চক। তোরা দেখবি কী রে! সর্বনাশ! তিনি তো যূনকদের গুরু নন। তাঁর কথা তোদের কানে পাছে এক অক্ষরও যায় সেজন্যে তোদের দিকের প্রাচীরের বাইরে সাত সার রাজার সৈন্য পাহারা দেবে। তোদেরও তো গুরু আছে — তাকে নিয়েই —

তৃতীয় যূনক। গুরু! আমাদের আবার গুরু কোথায়? আমরা তো হলুম দাদাঠাকুরের দল। এপর্যন্ত আমরা তো কোনো গুরুকে মানিনি।

প্রথম যূনক। সেইজন্যই তো জিনিসটা কী রকম দেখতে ইচ্ছা করে।

দ্বিতীয় যূনক। আমাদের মধ্যে একজন, তার নাম চণ্ডক — তার কী জানি ভারি লোভ হয়েছে; সে ভেবেছে তোমাদের কোনো গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়ে আশ্চর্য কী একটা ফল পাবে — তাই সে লুকিয়ে চলে গেছে।

তৃতীয় যূনক। কিন্তু যূনক বলে কেউ তাকে মন্ত্র দিতে চায় না। সেও ছাড়বার ছেলে নয়, সে লেগেই রয়েছে। তোমরা মন্ত্র দাও না বলেই মন্ত্র আদায় করবার জন্যে তার এত জেদ।

প্রথম যূনক। কিন্তু পঞ্চকদাদা, আমাদের ছুঁলে কী তোমার গুরু রাগ করবেন?

পঞ্চক। বলতে পারিনে — কী জানি যদি অপরাধ নেন। ওরে, তোরা যে সবাই সবরকম কাজই করিস — সেইটে যে বড়ো দোষ। তোরা চাষ করিস তো?

প্রথম যূনক। চাষ করি বইকি, খুব করি। পৃথিবীতে জন্মেছি, পৃথিবীকে সেটা খুব কষে বুঝিয়ে দিয়ে তবে ছাড়ি।

গান

আমরা চাষ করি আনন্দে।
মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধে।
রৌদ্র ওঠে, বৃষ্টি পড়ে, বাঁশের বনে পাতা নড়ে,
বাতাস ওঠে ভরে ভরে চষা মাটির গন্ধে।
সবুজ প্রাণের গানের লেখা, রেখায় রেখায় দেয় রে দেখা,
মাতে রে কোন তরুণ কবি নৃত্যদোদুল ছন্দে।
ধানের শিষে পুলক ছোটে, সকল ধরা হেসে ওঠে,
অঘ্রানেরি সোনার রোদে পূর্ণিমারি চন্দ্রে।।

পঞ্চক। আচ্ছা, না হয় তোরা চাষই করিস, সেও কোনোমতে সহ্য হয় — কিন্তু কে বলছিল তোরা কাঁকুড়ের

চাষ করিস?

প্রথম যূনক। করি বইকি।

পঞ্চক। কাঁকুড়! ছি ছি! খেঁসারিডালেরও চাষ করিস বুঝি?

তৃতীয় যূনক। কেন করব না? এখান থেকেই তো কাঁকুড় আর খেঁসারিডাল তোমাদের বাজারে যায়।

পঞ্চক। তা তো যায়, কিন্তু জানিস নে কাঁকুড় আর খেঁসারিডাল যারা চাষ করে তাদের আমরা ঘরে ঢুকতে দিইনে।

প্রথম যূনক। কেন?

পঞ্চক। কেন কী রে! ওটা যে নিষেধ।

প্রথম যূনক। কেন নিষেধ?

পঞ্চক। শোনো একবার! নিষেধ, আবার কেন! সাধে তোদের মুখদর্শন পাপ। এই সহজ কথাটা বুঝিসনে যে, কাঁকুড় আর খেঁসাড়িডালের চাষটা ভয়ানক খারাপ।

দ্বিতীয় যূনক। কেন? ওটা কী তোমরা খাও না।

পঞ্চক। খাই বইকি, খুব আদর করে খাই — কিন্তু ওটা যারা চাষ করে তাদের ছায়া মাড়াই নে।

দ্বিতীয় যূনক। কেন?

পঞ্চক। ফের কেন? তোরা যে এতবড়ো নিরেট মূর্খ তা জানতুম না। আমাদের পিতামহ বিষ্কম্ভী কাঁকুড়ের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে খবর রাখিসনে বুঝি?

দ্বিতীয় যনূক। কাঁকুড়ের মধ্যে কেন?

পঞ্চক। আবার কেন? তোর যে ওই এক কেন-র জ্বালায় আমাকে অতিষ্ঠ করে তুললি।

তৃতীয় যূনক। আর খেঁসারির ডাল?

পঞ্চক। একবার কোন যুগে একটা খেঁসারিডালের গুঁড়ো উপবাসের দিন কোনো এক মস্ত বুড়োর ঠিক গোঁফের উপর পড়েছিল; তাতে তাঁর উপবাসের পুণ্যফল থেকে ষষ্টিসহস্র ভাগের এক ভাগ কম পড়ে গিয়েছিল; তাই তখনই সেইখানে দাঁড়িয়ে উঠে তিনি জগতের সমস্ত খেঁসারিডালের খেতের উপর অভিশাপ দিয়ে গেছেন। এতবড়ো তেজ! তোরা হলে কী করতিস বল দেখি!

প্রথম যূনক। আমাদের কথা বলো কেন? উপবাসের দিনে খেঁসারিডাল যদি গোঁফের উপর পর্যন্ত এগিয়ে আসে তা হলে তাকে আরো একটু এগিয়ে নিই।

পঞ্চক। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্যি করে বলিস — তোরা কি লোহার কাজ করে থাকিস?

প্রথম যূনক। লোহার কাজ করি বইকি, খুব করি।

পঞ্চক। রাম রাম! আমরা সনাতন কাল থেকে কেবল তামা-পিতলের কাজ করে আসছি। লোহা গলাতে

পারি কিন্তু সব দিন নয়। ষষ্ঠীর দিনে যদি মঙ্গলবার পড়ে তবেই স্নান করে আমরা হাপর ছুঁতে পারি কিন্তু তাই বলে লোহা পিটোনো সে তো হতেই পারে না।

প্রথম যূনক। কেন, লোহা কী অপরাধটা করেছে?

পঞ্চক। আরে ওটা যে লোহা সে তো তোকে মানতেই হবে।

প্রথম যূনক। তা তো হবে।

পঞ্চক। তবে আর কী — এই বুঝেনে না।

দ্বিতীয় যূনক। তবু একটা তো কারণ আছে।

পঞ্চক। কারণ নিশ্চয়ই আছে কিন্তু কেবল সেটা পুঁথির মধ্যে। আচ্ছা, তোদের মন্ত্র কেউ পড়ায়নি?

দ্বিতীয় যূনক। মন্ত্র! কীসের মন্ত্র?

পঞ্চক। এই মনে কর, যেমন বজ্রবিদারণ মন্ত্র — তট তট তোতয় তোতয় —

তৃতীয় যূনক। ওর মানে কী?

পঞ্চক। আবার! মানে! তোর আস্পর্ধা তো কম নয়। সব কথাতেই মানে! কেয়ূরী মন্ত্রটা জানিস?

প্রথম যূনক। না।

পঞ্চক। মরীচী?

প্রথম যূনক। না।

পঞ্চক। মহাশীতবতী?

প্রথম যূনক। না।

পঞ্চক। উষ্ণীষবিজয়?

প্রথম যূনক। না।

পঞ্চক। নাপিত ক্ষৌর করতে করতে যেদিন তোদের বাঁ গালে রক্ত পাড়িয়ে দেয় সেদিন করিস কী?

তৃতীয় যূনক। সেদিন নাপিতের দুই গালে চড় কষিয়ে দিই।

পঞ্চক। না রে না, আমি বলছি সেদিন নদী পার হবার দরকার হলে তোরা খেয়া নৌকোয় উঠতে পারিস?

তৃতীয় যূনক। খুব পারি।

পঞ্চক। ওরে, তোরা আমাকে মাটি করলি রে। আমি আর থাকতে পারছি নে। তোদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে সাহস হচ্ছে না। এমন জবাব যদি আর একটা শুনতে পাই তোদের বুকে করে পাগলের মতো নাচব, আমার জাতমান কিছুই থাকবে না। ভাই, তোরা সব কাজই করতে পাস? তোদের দাদাঠাকুর কিছুতেই তোদের মানা করে না?

যূনকগণের গান

সব কাজে হাত লাগাই মোরা, সব কাজেই।
বাধাবাঁধন নেই গো নেই।
দেখি, খুঁজি, বুঝি,
কেবল ভাঙি, গড়ি, যুঝি,
মোরা সব দেশেতেই বেড়াই ঘুরে সব সাজেই।
পারি, নাই বা পারি,
নাহয় জিতি কিংবা হারি,
যদি অমনিতে হাল ছাড়ি, মরি সেই লাজেই।
আপন হাতের জোরে
আমরা তুলি সৃজন করে,
আমরা প্রাণ দিয়ে ঘর বাঁধি, থাকি তার মাঝেই।

পঞ্চক। সর্বনাশ করলে রে — আমার সর্বনাশ করলে! আমার আর ভদ্রতা রাখলে না। এদের তালে তালে আমারও পা দুটো নেচে উঠছে। আমাকে সুদ্ধ এরা টানবে দেখছি। কোন্‌দিন আমিও লোহা পিটোব রে লোহা পিটোব — কিন্তু খেঁসারির ডাল — না না, পালা ভাই, পালা তোরা। দেখছিস না, পড়ব বলে পুঁথি সংগ্রহ করে এনেছি।

আর একদল যূনকের প্রবেশ

প্রথম যূনক। ও ভাই পঞ্চক, দাদাঠাকুর আসছে।

দ্বিতীয় যূনক। এখন রাখো তোমার পুঁথি, রাখো — দাদাঠাকুর আসছে।

দাদাঠাকুরের প্রবেশ

প্রথম যূনক। দাদাঠাকুর!

দাদাঠাকুর। কীরে?

দ্বিতীয় যূনক। দাদাঠাকুর!

দাদাঠাকুর। কী চাই রে?

তৃতীয় যুনক। কিছু চাই নে — একবার তোমাকে ডেকে নিচ্ছি।

পঞ্চক। দাদাঠাকুর!

দাদাঠাকুর। কী ভাই, পঞ্চক যে!

পঞ্চক। ওরা সবাই তোমায় ডাকছে, আমারও কেমন ডাকতে ইচ্ছে হল। যতই ভাবছি ওদের দলে মিশব না ততই আরো জড়িয়ে পড়ছি।

প্রথম যূনক। আমাদের দাদাঠাকুরকে নিয়ে আবার দল কীসের? উনি আমাদের সব দলের শতদল পদ্ম।

পঞ্চক। ও ভাই, তোদের দাদাঠাকুরকে নিয়ে তোরা তো দিনরাত মাতামাতি করছিস, একবার আমাকে ছেড়ে দে, আমি একটু নিরালায় বসে কথা কই। ভয় নেই, ওঁকে আমাদের অচলায়তনে নিয়ে গিয়ে কপাট দিয়ে রাখব না।

প্রথম যূনক। নিয়ে যাও না। সে তো ভালোই হয়। তা হলে কপাটের বাপের সাধ্য নেই বন্ধ থাকে। উনি গেলে তোমাদের অচলায়তনের পাথরগুলো সুদ্ধ নাচতে আরম্ভ করবে, পুঁথিগুলোর মধ্যে বাঁশি বাজবে।

পঞ্চক। দাদাঠাকুর, শুনছি আমাদের গুরু আসছেন।

দাদাঠাকুর। গুরু! কী বিপদ! ভারি উৎপাত করবে তা হলে তো।

পঞ্চক। একটু উৎপাত হলে যে বাঁচি। চুপচাপ থেকে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে।

দাদাঠাকুর। আচ্ছা বেশ, তোমার গুরু এলে তাকে দেখে নেওয়া যাবে। এখন তুমি আছ কেমন বলো তো?

পঞ্চক। ভয়ানক টানাটানির মধ্যে আছি ঠাকুর। মনে মনে প্রার্থনা করছি গুরু এসে যে দিকে হোক এক দিকে আমাকে ঠিক করে রাখুন — হয় এখানকার খোলা হাওয়ার মধ্যে অভয় দিয়ে ছাড়া দিন, নয় তো খুব কষে পুঁথি চাপা দিয়ে রাখুন; মাথা থেকে পা পর্যন্ত আগাগোড়া একেবারে সমান চ্যাপ্টা হয়ে যাই।

একদল যূনকের প্রবেশ

দাদাঠাকুর। কী রে, এত ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলি কেন?

প্রথম যূনক। চণ্ডককে মেরে ফেলেছে।

দাদাঠাকুর। কে মেরেছে?

দ্বিতীয় যূনক। স্থবিরপত্তনের রাজা।

পঞ্চক। আমাদের রাজা? কেন, মারতে গেল কেন?

দ্বিতীয় যূনক। স্থবিরক হয়ে ওঠবার জন্যে চণ্ডককে বনের মধ্যে এক পোড়ো মন্দিরে তপস্যা করছিল। ওদের রাজা মন্থরগুপ্ত সেই খবর পেয়ে তাকে কেটে ফেলেছে।

তৃতীয় যূনক। আগে ওদের দেশের প্রাচীর পঁয়ত্রিশ হাত উঁচু ছিল, এবার আশি হাত উঁচু করবার জন্যে লোক লাগিয়ে দিয়েছে, পাছে পৃথিবীর সব লোক লাফ দিয়ে গিয়ে হঠাৎ স্থবিরক হয়ে ওঠে।

চতুর্থ যূনক। আমাদের দেশ থেকে দশজন যূনক ধরে নিয়ে গেছে, হয়তো ওদের কালঝণ্টি দেবীর কাছে বলি দেবে।

দাদাঠাকুর। চলো তবে।

প্রথম যূনক। কোথায়?

দাদাঠাকুর। স্থবিরপত্তনে।

দ্বিতীয় যূনক। এখনই?

দাদাঠাকুর। হাঁ এখনই।

সকলে। ওরে, চল্ রে চল্।

দাদাঠাকুর। আমাদের রাজার আদেশ আছে ওদের পাপ যখন প্রাচীরের আকার ধরে আকাশের জ্যোতি আচ্ছন্ন করতে উঠবে তখন সেই প্রাচীর ধুলোয় লুটিয়ে দিতে হবে।

প্রথম যূনক। দেব ধুলোয় লুটিয়ে।

সকলে। দেব লুটিয়ে।

দাদাঠাকুর। ওদের সেই ভাঙা প্রাচীরের উপর দিয়ে রাজপথ তৈরি করে দেব।

সকলে। হাঁ, রাজপথ তৈরি করে দেব।

দাদাঠাকুর। আমাদের রাজার বিজয়রথ তার উপর দিয়ে চলবে।

সকলে। হাঁ, চলবে, চলবে।

পঞ্চক। দাদাঠাকুর, এ কী ব্যাপার?

প্রথম যূনক। চলো, পঞ্চক, তুমি চলো।

দাদাঠাকুর। না না, পঞ্চক না। যাও ভাই, তুমি তোমার অচলায়তনে ফিরে যাও। যখন সময় হবে দেখা হবে।

পঞ্চক। কী জানি ঠাকুর, যদিও আমি কোনো কর্মের না, তবুও ইচ্ছে করছে তোমাদের সঙ্গে ছুটে বেরিয়ে পড়ি।

দাদাঠাকুর। না পঞ্চক, না তোমার গুরু আসবেন, তুমি অপেক্ষা করো গে।

[প্রস্থান

৩

দর্ভকপল্লি

পঞ্চক ও দর্ভকদল

পঞ্চক। নির্বাসন, আমার নির্বাসনরে! বেঁচে গেছি, বেঁচে গেছি!

প্রথম দর্ভক। তোমাদের কী খেতে দেব ঠাকুর?

পঞ্চক। তোদের যা আছে তাই আমরা খাব।

দ্বিতীয় দর্ভক। আমাদের খাবার? সে কী হয়? সে যে সব ছোঁওয়া হয়ে গেছে।

পঞ্চক। সেজন্য ভাবিস নে ভাই। পেটের খিদে যে আগুন, সে কারও ছোঁয়া মানে না, সবই পবিত্র করে। ওরে, তোরা সকালবেলায় করিস কী বল তো। ষড়ক্ষরিত দিয়ে একবার ঘটশুদ্ধি করে নিবিনে?

তৃতীয় দর্ভক। ঠাকুর, আমরা নীচ দর্ভক জাত — আমরা ও সব কিছুই জানি নে। আজ কত পুরুষ ধরে এখানে বাস করে আসছি, কোনোদিন তো তোমাদের পায়ের ধুলো পড়েনি। আজ তোমাদের মন্ত্র পড়ে আমাদের বাপ-পিতামহকে উদ্ধার করে দাও ঠাকুর।

পঞ্চক। সর্বনাশ! বলিস কী? এখানেও মন্ত্র পড়তে হবে! তাহলে নির্বাসনের দরকার কী ছিল? তা, সকালবেলা

তোরা কী করিস বল তো?

প্রথম দর্ভক। আমরা শাস্ত্র জানি নে, আমরা নাম গান করি।

পঞ্চক। সে কী রকম ব্যাপার? শোনা দেখি একটা।

দ্বিতীয় দর্ভক। ঠাকুর, সে তুমি শুনে হাসবে।

পঞ্চক। আমিই তো ভাই, এতদিন লোক হাসিয়ে আসছি — তোরা আমাকেও হাসাবি — শুনেও মন খুশি হয়। কিন্তু ভাবিস নে — নির্ভয়ে শুনিয়ে দে।

প্রথম দর্ভক। আচ্ছা ভাই, আয় তবে — গান ধর।

গান

ও অকূলের কূল, ও অগতির গতি,
ও অনাথের নাথ, ও পতিতের পতি।
ও নয়নের আলো, ও রসনার মধু,
ও রতনের হার, ও পরানের বঁধু।
ও অপরূপ রূপ, ও মনোহর কথা,
ও চরমের সুখ, ও মরমের ব্যথা,
ও ভিখারির ধন, ও অবোলার বোল—
ও জনমের দোলা, ও মরণের কোল।

পঞ্চক। দে ভাই, আমার মন্ত্রতন্ত্র সব ভুলিয়ে দে, আমার বিদ্যাসাধ্যি সব কেড়ে নে, দে আমাকে তোদের ওই গান শিখিয়ে দে।

আচার্যের প্রবেশ

প্রথম দর্ভক। বাবাঠাকুর, আমাদের সমস্ত পাড়া আজ ত্রাণ পেয়ে গেল। এতদিন তোমার চরণধুলো তো এখানে পড়েনি।

আচার্য। সে আমার অভাগ্য, সে আমারই অভাগ্য।

দ্বিতীয় দর্ভক। বাবা, তোমার স্নানের জল কাকে দিয়ে তোলাব? এখানে তো —

আচার্য। বাবা, তোরাই তুলে আনবি।

প্রথম দর্ভক। আমরা তুলে আনব — সে কী হয়!

আচার্য। হাঁ বাবা, তোদের তোলা জলে আজ আমার অভিষেক হবে।

দ্বিতীয় দর্ভক। ওরে চল্ তবে ভাই চল্। আমাদের পাটলা নদী থেকে জল আনি গে।

[দর্ভকদলের প্রস্থান

পঞ্চক। মনে হচ্ছে যেন ভিজে মাটির গন্ধ পাচ্ছি, কোথায় যেন বর্ষা নেমেছে।

আচার্য। ওই, পঞ্চক শুনতে পাচ্ছ কি?

পঞ্চক। কী বলুন দেখি?

আচার্য। আমার মনে হচ্ছে যেন সুভদ্র কাঁদছে।

পঞ্চক। এখান থেকে কি শোনা যাবে? এ বোধ হয় আর কোনো শব্দ।

আচার্য। তা হবে পঞ্চক, আমি তার কান্না আমার বুকের মধ্যে করে এনেছি। তার কান্নাটা এমন করে আমাকে বেজেছে কেন জানো? সে যে কান্না রাখতে পারে না তবু কিছুতে মানতে চায় না সে কাঁদছে।

পঞ্চক। এতক্ষণে ওরা তাকে মহাতামসে বসিয়েছে — আর সকলে মিলে খুব দূরে থেকে বাহবা দিয়ে বলছে, সুভদ্র দেবশিশু। আর কিছু না, আমি যদি রাজা হতুম তাহলে ওদের সবাইকে কান ধরে দেবতা করে দিতুম — কিছুতে ছাড়তুম না।

আচার্য। ওরা ওদের দেবতাকে কাঁদাচ্ছে পঞ্চক। সেই দেবতারই কান্নায় এ রাজ্যের সকল আকাশ আকুল হয়ে উঠছে। তবু ওদের পাষাণের বেড়া এখনো শতধা বিদীর্ণ হয়ে গেল না।

দর্ভকদলের প্রবেশ

পঞ্চক। কী ভাই, তোরা এত ব্যস্ত কীসের?

প্রথম দর্ভক। শুনেছি অচলায়তনে কারা সব লড়াই করতে এসেছে।

আচার্য। লড়াই কীসের? আজ তো গুরুর আসবার কথা।

দ্বিতীয় দর্ভক। না না, লড়াই হচ্ছে খবর পেয়েছি। সমস্ত ভেঙে চুরে একাকার করে দিলে যে।

তৃতীয় দর্ভক। বাবাঠাকুর, তোমরা যদি হুকুম করো আমরা যাই ঠেকাই গিয়ে।

আচার্য। ওখানে তো লোক ঢের আছে, তোমাদের ভয় নেই বাবা।

প্রথম দর্ভক। লোক তো আছে, কিন্তু তারা লড়াই করতে পারবে কেন?

দ্বিতীয় দর্ভক। শুনেছি কতরকম মন্ত্রলেখা তাগাতাবিজ দিয়ে তারা দু-খানা হাত আগাগোড়া কষে বেঁধে রেখেছে। খোলে না, পাছে কাজ করতে গেলেই তাদের হাতের গুণ নষ্ট হয়।

পঞ্চক। আচার্যদেব, এদের সংবাদটা সত্যই হবে। কাল সমস্ত রাত মনে হচ্ছিল, চার দিকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন ভেঙে চুরে পড়ছে। ঘুমের ঘোরে ভাবুছিলুম, স্বপ্ন বুঝি।

আচার্য। তবে কি গুরু আসেননি?

পঞ্চক। হয়তো বা দাদা ভুল করে আমার গুরুরই সঙ্গে লড়াই বাধিয়ে বসেছেন! আটক নেই। রাত্রে তাঁকে হঠাৎ দেখে হয়তো যমদূত বলে ভুল করেছিলেন।

প্রথম দর্ভক। আমরা শুনেছি, কে বলছিল গুরুও এসেছেন।

আচার্য। গুরুও এসেছেন! সে কী রকম হল?

পঞ্চক। তবে লড়াই করতে কারা এসেছে বলো তো।

প্রথম দর্ভক। লোকের মুখে শুনি তাদের নাকি বলে, দাদাঠাকুরের দল।

পঞ্চক। দাদাঠাকুরের দল! বল্ বল্ শুনি, ঠিক বলছিস তো রে?

প্রথম দর্ভক। বাবাঠাকুর, হুকুম করো, একবার ওদের সঙ্গে লড়ে আসি — দেখিয়ে দিই, এখানে মানুষ আছে।

পঞ্চক। আয় না ভাই, আমিও তোদের সঙ্গে চলবরে।

দ্বিতীয় দর্ভক। তুমিও লড়বে নাকি ঠাকুর?

পঞ্চক। হাঁ লড়ব।

আচার্য। কী বলছ পঞ্চক! তোমাকে লড়তে কে ডাকছে?

মালীর প্রবেশ

মালী। আচার্যদেব, আমাদের গুরু আসছেন।

আচার্য। বলিস কী? গুরু? তিনি এখানে আসছেন? আমাকে আহ্বান করলেই তো আমি যেতুম।

প্রথম দর্ভক। এখানে তোমাদের গুরু এলে তাঁকে বসাব কোথায়?

দ্বিতীয় দর্ভক। বাবাঠাকুর, তুমি এখানে তাঁর বসবার জায়গাটাকে একটু শোধন করে নাও — আমরা তফাতে সরে যাই।

আর-একদল দর্ভকের প্রবেশ

প্রথম দর্ভক। বাবাঠাকুর, এ তোমাদের গুরু নয় — সে এ পাড়ায় আসবে কেন? এ যে আমাদের গোঁসাই।

দ্বিতীয় দর্ভক। আমাদের গোঁসাই?

প্রথম দর্ভক। হাঁ রে হাঁ, আমাদের গোঁসাই! এমন সাজ তার আর কখনো দেখিনি। একেবারে চোখ ঝলসে যায়।

তৃতীয় দর্ভক। ঘরে কী আছেরে ভাই, সব বের কর।

দ্বিতীয় দর্ভক। বনের জাম আছে রে।

চতুর্থ দর্ভক। আমার ঘরে খেজুর আছে।

প্রথম দর্ভক। কালো গোরুর দুধ শিগগির দুয়ে আন দাদা।

দাদাঠাকুরের প্রবেশ

আচার্য। (প্রণাম করিয়া) জয় গুরুজির জয়!

পঞ্চক। এ কী! এ যে দাদাঠাকুর! গুরু কোথায়?

দর্ভকদল। গোঁসাই ঠাকুর! প্রণাম হই। খবর দিয়ে এলে না কেন? তোমার ভোগ যে তৈরি হয়নি।

দাদাঠাকুর। কেন ভাই, তোদের ঘরে আজ রান্না চড়েনি নাকি? তোরাও মন্ত্র নিয়ে উপোস করতে আরম্ভ করেছিস না কিরে?

প্রথম দর্ভক। আমরা আজ শুধু মাষকলাই আর ভাত চড়িয়েছি। ঘরে আর কিছু ছিল না।

দাদাঠাকুর। আমারও তাতেই হয়ে যাবে।

পঞ্চক। দাদাঠাকুর, আমার ভারি গর্ব ছিল এ রাজ্যে একলা আমিই কেবল চিনি তোমাকে। কারও যে চিনতে আর বাকি নেই!

প্রথম দর্ভক। ওই তো আমাদের গোঁসাই — পূর্ণিমার দিনে এসে আমাদের পিঠে খেয়ে গেছে, তারপর এই কতদিন পরে দেখা। চল ভাই, আমাদের যা আছে সব সংগ্রহ করে আনি।

[প্রস্থান

দাদাঠাকুর। আচার্য, তুমি এ কী করেছ!

আচার্য। কী যে করেছি তা বোঝবারও শক্তি আমার নেই। তবে এইটুকু বুঝি — আমি সব ন ষ্টকরেছি।

দাদাঠাকুর। যিনি তোমাকে মুক্তি দেবেন তাঁকেই তুমি কেবল বাঁধবার চেষ্টা করেছ।

আচার্য। কিন্তু বাঁধতে তো পারিনি ঠাকুর। তাঁকে বাঁধছি মনে করে যতগুলো পাক দিয়েছি সব পাক কেবল নিজের চার দিকেই জড়িয়েছি। যে হাত দিয়ে সেই বাঁধন খোলা যেতে পারত সেই হাতটা সুদ্ধ বেঁধে ফেলেছি।

দাদাঠাকুর। যিনি সব জায়গায় আপনি ধরা দিয়ে বসে আছেন তাঁকে একটা জায়গায় ধরতে গেলেই তাঁকে হারাতে হয়।

আচার্য। আদেশ করো প্রভু। ভুল করেছিলুম জেনেও সে ভুল ভাঙতে পারিনি। পথ হারিয়েছি তা জানতুম, যতই চলছি ততই পথ হতে কেবল বেশি দূর গিয়ে পড়ছি তাও বুঝতে পেরেছিলুম, কিন্তু ভয়ে থামতে পারছিলুম না। এই চক্রে হাজার বার ঘুরে বেড়ানোকেই পথ খুঁজে পাবার উপায় বলে মনে করেছিলুম।

দাদাঠাকুর। যে চক্র কেবল অভ্যাসের চক্র, যা কোনো জায়গাতেই নিয়ে যায় না, কেবল নিজের মধ্যেই ঘুরিয়ে মারে, তার থেকেই বের করে সোজা রাস্তায় বিশ্বের সকল যাত্রীর সঙ্গে দাঁড় করিয়ে দেবার জন্যেই আমি আজ এসেছি।

আচার্য। ধন্য করেছ! — কিন্তু এতদিন আসনি কেন প্রভু? আমাদের আয়তনের পাশেই এই দর্ভকপাড়ায় তুমি আনাগোনা করছ, আর কত বৎসর হয়ে গেল আমাদের আর দেখা দিলে না।

দাদাঠাকুর। এদের দেখা দেওয়ার রাস্তা যে সোজা। তোমাদের সঙ্গে দেখা করা তো সহজ করে রাখনি।

পঞ্চক। ভালোই করেছি, তোমার শক্তি পরীক্ষা করে নিয়েছি। তুমি আমাদের পথ সহজ করে দেবে, কিন্তু তোমার পথ সহজ নয়। এখন, আমি ভাবছি তোমাকে ডাকব কী বলে? দাদাঠাকুর, না গুরু।

দাদাঠাকুর। যে জানতে চায় না, আমি তাকে চালাচ্ছি আমি তার দাদাঠাকুর, আর যে আমার আদেশ নিয়ে চলতে চায় আমি তার গুরু।

পঞ্চক। প্রভু, তুমি তাহলে আমার দুইই। আমাকে আমিই চালাচ্ছি আর আমাকে তুমিই চালাচ্ছ, এই দুটোই আমি মিশিয়ে জানতে চাই। আমি তো যূনক নই, তোমাকে মেনে চলতে ভয় নেই। তোমার মুখের আদেশকেই আনন্দে আমার মনের ইচ্ছা করে তুলতে পারব। এবার তবে তোমার সঙ্গে তোমারই বোঝা মাথায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ি ঠাকুর।

দাদাঠাকুর। আমি তোমার জায়গা ঠিক করে রেখেছি।

পঞ্চক। কোথায় ঠাকুর?

দাদাঠাকুর। ওই অচলায়তনে।

পঞ্চক। আবার অচলায়তনে? আমার কারদণ্ডের মেয়াদ ফুরোয়নি?

দাদাঠাকুর। কারাগার যা ছিল সে তো আমি ভেঙে ফেলেছি, এখন সেই উপকরণ দিয়ে সেইখানেই তোমাকে মন্দির গেঁথে তুলতে হবে।

পঞ্চক। কিন্তু অচলায়তনের লোকে যে আমাকে আপন বলে গ্রহণ করবে না প্রভু।

দাদাঠাকুর। ওরা তোমাকে গ্রহণ করতে চাচ্ছে না, সেইজন্যেই ওখানে তোমার সবচেয়ে দরকার। ওরা তোমাকে ঠেলে দিচ্ছে বলেই তুমি ওদের ঠেলতে পারবে না।

পঞ্চক। আমাকে কী করতে হবে?

দাদাঠাকুর। যে যেখানে ছড়িয়ে আছে সবাইকে ডাক দিয়ে আনতে হবে।

পঞ্চক। সবাইকে কি কুলোবে?

দাদাঠাকুর। না যদি কুলোয় তা হলে দেয়াল আর একদিন ভাঙতেই হবে। আমি এখন চললুম অচলায়তনের দ্বার খুলতে।

[প্রস্থান

৪

অচলায়তন

মহাপঞ্চক, সঞ্জীব, বিশ্বম্ভর, জয়োত্তম

মহাপঞ্চক। তোমরা এত ব্যস্ত হয়ে পড়ছ কেন? কোনো ভয় নেই।

বিশ্বম্ভর। তুমি তো বলছ ভয় নেই, এই যে খবর এল, শত্রুসৈন্য অচলায়তনের প্রাচীর ফুটো করে দিয়েছে।

মহাপঞ্চক। এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। শিলা জলে ভাসে! ম্লেচ্ছরা অচলায়তনের প্রাচীর ফুটো করে দেবে! পাগল হয়েছ?

সঞ্জীব। কে যে বললে দেখে এসেছে।

মহাপঞ্চক। সে স্বপ্ন দেখেছে।

জয়োত্তম। আজই তো আমাদের গুরুর আসবার কথা।

মহাপঞ্চক। তাঁর জন্যে সমস্ত আয়োজন ঠিক হয়ে গেছে; কেবল যে ছেলের মা-বাপ, ভাই-বোন কেউ মরেনি এমন নবম গর্ভের সন্তান এখনো জুটিয়ে আনতে পারলে না — দ্বারে দাঁড়িয়ে কে যে মহারক্ষা পড়বে ঠিক করতে পারছিনে।

সঞ্জীব। গুরু এলে তাঁকে চিনে নেবে কে? আচার্য অদীনপুণ্য তাঁকে জানতেন। আমরা তো কেউ তাঁকে দেখিনি।

মহাপঞ্চক। আমাদের আয়তনে যে শাঁখ বাজায় সেই বৃদ্ধ তাঁকে দেখেছে। আমাদের পূজার ফুল যে জোগায় সেও তাঁকে জানে।

বিশ্বম্ভর। ওই যে উপাধ্যায় ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসছেন।

মহাপঞ্চক। নিশ্চয় গুরু আসার সংবাদ পেয়েছেন। কিন্তু মহারক্ষা পাঠের কী করা যায়। ঠিক লক্ষণসম্পন্ন ছেলে তো পাওয়া গেল না।

উপাধ্যায়ের প্রবেশ

মহাপঞ্চক। কত দূর?

উপাধ্যায়। কত দূর কী? এসে পড়েছে যে।

মহাপঞ্চক। কই দ্বারে তো এখনো শাঁখ বাজালে না?

উপাধ্যায়। বিশেষ দরকার দেখিনে— কারণ দ্বারের চিহ্নও দেখতে পাচ্ছিনে — ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

মহাপঞ্চক। বলো কী, দ্বার ভেঙেছে?

উপাধ্যায়। শুধু দ্বার নয়, প্রাচীরগুলোকে এমনি সমান করে শুইয়ে দিয়েছে যে তাদের সম্বন্ধে আর কোনো চিন্তা করবার দরকার নেই। ওই দেখছ না আলো।

মহাপঞ্চক। কিন্তু আমাদের দৈবজ্ঞ যে গণনা করে স্পষ্ট দেখিয়ে দিয়ে গেল যে —

উপাধ্যায়। তার চেয়ে ঢের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে শত্রুসৈন্যদের রক্তবর্ণ টুপিগুলো। এই যে সব ফাঁক হয়ে গেছে।

ছাত্রগণ। কী সর্বনাশ!

সঞ্জীব। কীসের মন্ত্র তোমার মহাপঞ্চক?

বিশ্বম্ভর। আমি তো তখনই বলেছিলুম, এসব কাজ এই কাঁচা বয়সের পুঁথিপড়া অকালপক্কদের দিয়ে হবার নয়।

সঞ্জীব। কিন্তু এখন করা যায় কী?

জয়োত্তম। আমাদের আচার্যদেবকে এখনই ফিরিয়ে আনি গে। তিনি থাকলে এ বিপত্তি ঘটতেই পারত না। হাজার হোক লোকটা পাকা।

সঞ্জীব। কিন্তু দেখো মহাপঞ্চক, আমাদের আয়তনের যদি কোনো বিপত্তি ঘটে তা হলে তোমাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলব।

উপাধ্যায়। সে পরিশ্রমটা তোমাদের করতে হবে না, উপযুক্ত লোক আসছে।

মহাপঞ্চক। তোমরা মিথ্যা বিচলিত হচ্ছ। বাইরের প্রাচীর ভাঙতে পারে, কিন্তু ভিতরের লোহার দরজা বন্ধ আছে। সে যখন ভাঙবে তখন চন্দ্রসূর্য নিবে যাবে। আমি অভয় দিচ্ছি তোমরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে অচলায়তনের রক্ষক-দেবতার আশ্চর্য শক্তি দেখে নাও।

উপাধ্যায়। তার চেয়ে দেখি কোন দিক দিয়ে বেরোবার রাস্তা।

বিশ্বম্ভর। আমাদেরও তো সেই ইচ্ছা। কিন্তু এখান থেকে বেরোবার পথ যে জানিই নে। কোনোদিন বেরোতে হবে বলে স্বপ্নেও মনে করিনে।

সঞ্জীব। শুনছ—ওই শুনছ, ভেঙে পড়ল সব।

ছাত্রগণ। কী হবে আমাদের। নিশ্চয় দরজা ভেঙেছে। এই যে একেবারে নীল আকাশ।

বালকদলের প্রবেশ

উপাধ্যায়। কীরে তোরা সব নৃত্য করছিস কেন?

প্রথম বালক। আজ এ কী মজা হল।

উপাধ্যায়। মজাটা কী রকম শুনি?

দ্বিতীয় বালক। আজ চার দিক থেকেই আলো আসছে—সব যেন ফাঁক হয়ে গেছে।

তৃতীয় বালক। এত তো আমরা কোনোদিন দেখিনি।

প্রথম বালক। কোথাকার পাখির ডাক এখান থেকেই শোনা যাচ্ছে।

দ্বিতীয় বালক। এসব পাখির ডাক আমরা তো কোনোদিন শুনিনি। এ তো আমাদের খাঁচার ময়নার মতো একেবারেই নয়।

প্রথম বালক। আজ আমাদের খুব ছুটতে ইচ্ছে করছে। তাতে কি দোষ হবে মহাপঞ্চকদাদা?

মহাপঞ্চক। আজকের কথা ঠিক বলতে পারছি নে। আজ কোনো নিয়ম রক্ষা করা চলবে বলে বোধ হচ্ছে না।

প্রথম বালক। আজ তা হলে আমাদের ষড়াসন বন্ধ?

মহাপঞ্চক। হাঁ, বন্ধ।

সকলে। ওরে কী মজারে কী মজা।

দ্বিতীয় বালক। আজ পঙ্‌ক্তি ধৌতির দরকার নেই?

মহাপঞ্চক। না।

সকলে। ওরে কী মজা। আঃ আজ চার দিকে কী আলো।

জয়োত্তম। আমারও মনটা নেচে উঠেছে বিশ্বম্ভর! এ কী ভয়, না আনন্দ, কিছুই বুঝতে পারছিনে।

বিশ্বম্ভর। আজ একটা অদ্ভুত কাণ্ড হচ্ছে জয়োত্তম।

সঞ্জীব। কিন্তু ব্যাপারটা যে কী, ভেবে উঠতে পারছিনে। ওরে ছেলেগুলো, তোরা হঠাৎ এত খুশি হয়ে উঠলি কেন বল দেখি।

প্রথম বালক। দেখছ না, সমস্ত আকাশটা যেন ঘরের মধ্যে দৌড়ে এসেছে।

দ্বিতীয় বালক। মনে হচ্ছে ছুটি—আমাদের ছুটি।

[বালকদের প্রস্থান

জয়োত্তম। দেখো মহাপঞ্চকদাদা, আমার মনে হচ্ছে ভয় কিছুই নেই—নইলে ছেলেদের মন এমন অকারণে খুশি হয়ে উঠল কেন?

মহাপঞ্চক। ভয় নেই সে তো আমি বরাবর বলে আসছি।

শঙ্খবাদক ও মালীর প্রবেশ

উভয়ে। গুরু আসছেন।

সকলে। গুরু!

মহাপঞ্চক। শুনলে তো। আমি নিশ্চয় জানতুম তোমাদের আশঙ্কা বৃথা।

সকলে। ভয় নেই আর ভয় নেই।

বিশ্বম্ভর। মহাপঞ্চক যখন আছেন তখন কি আমাদের ভয় থাকতে পারে।

সকলে। জয় আচার্য মহাপঞ্চকের।

যোদ্ধৃবেশে দাদাঠাকুরের প্রবেশ

শঙ্খবাদক ও মালী। (প্রণাম করিয়া) জয় গুরুজির জয়!

সকলে স্তম্ভিত

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, এই কি গুরু?

উপাধ্যায়। তাই তো শুনছি।

মহাপঞ্চক। তুমি কি আমাদের গুরু?

দাদাঠাকুর। হাঁ! তুমি আমাকে চিনবে না, কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।

মহাপঞ্চক। তুমি গুরু? তুমি আমাদের সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে এ কোন পথ দিয়ে এলে? তোমাকে কে মানবে?

দাদাঠাকুর। আমাকে মানবে না জানি, কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।

মহাপঞ্চক। তুমি গুরু? তবে এই শত্রুবেশে কেন?

দাদাঠাকুর। এই তো আমার গুরুর বেশ। তুমি যে আমার সঙ্গে লড়াই করবে—সেই লড়াই আমার গুরুর অভ্যর্থনা।

মহাপঞ্চক। কেন তুমি আমাদের প্রাচীর ভেঙে দিয়ে এলে?

দাদাঠাকুর। তুমি কোথাও তোমার গুরুর প্রবেশের পথ রাখোনি।

মহাপঞ্চক। তুমি কি মনে করেছ তুমি অস্ত্র হাতে করে এসেছ বলে আমি তোমার কাছে হার মানব?

দাদাঠাকুর। না, এখনই না। কিন্তু দিনে দিনে হার মানতে হবে, পদে পদে।

মহাপঞ্চক। আমাকে নিরস্ত্র দেখে ভাবছ আমি তোমাকে আঘাত করতে পারি নে?

দাদাঠাকুর। আঘাত করতে পারো কিন্তু আহত করতে পারো না—আমি যে তোমার গুরু।

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, তোমরা এঁকে প্রণাম করবে নাকি?

উপাধ্যায়। দয়া করে উনি যদি আমাদের প্রণাম গ্রহণ করেন তা হলে প্রণাম করব বইকি—তা নইলে যে—

মহাপঞ্চক। না, আমি তোমাকে প্রণাম করব না।

দাদাঠাকুর। আমি তোমার প্রণাম গ্রহণ করব না—আমি তোমাকে প্রণত করব।

মহাপঞ্চক। তুমি আমাদের পূজা নিতে আসনি?

দাদাঠাকুর। আমি তোমাদের পূজা নিতে আসিনি, অপমান নিতে এসেছি।

মহাপঞ্চক। তোমার পশ্চাতে অস্ত্রধারী এ কারা?

দাদাঠাকুর। এরা আমার অনুবর্তী — এরা যূনক।

সকলে। যূনক!

মহাপঞ্চক। এরাই তোমার অনুবর্তী?

দাদাঠাকুর। হাঁ।

মহাপঞ্চক। এই মন্ত্রহীন কর্মকাণ্ডহীন ম্লেচ্ছদল! আমি এই আয়তনের আচার্য—আমি তোমাকে আদেশ করছি তুমি এখনই ওই ম্লেচ্ছদলকে সঙ্গে নিয়ে বাহির হয়ে যাও।

দাদাঠাকুর। আমি যাকে আচার্য নিযুক্ত করব সেই আচার্য; আমি যা আদেশ করব সেই আদেশ।

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, আমরা এমন করে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। এসো আমরা এদের এখান থেকে বাহির করে দিয়ে আমাদের আয়তনের সমস্ত দরজাগুলো আবার একবার দ্বিগুণ দৃঢ় করে বন্ধ করি।

উপাধ্যায়। এরাই আমাদের বাহির করে দেবে, সেই সম্ভাবনাটাই প্রবল বলে বোধ হচ্ছে।

প্রথম যূনক। অচলায়তনের দরজার কথা বলছ—সে আরো আকাশের সঙ্গে দিব্যি সমান করে দিয়েছি।

উপাধ্যায়। বেশ করেছ ভাই। আমাদের ভারি অসুবিধা হচ্ছিল। এত তালাচাবির ভাবনাও ভাবতে হত।

মহাপঞ্চক। পাথরের প্রাচীর তোমরা ভাঙতে পারো, লোহার দরজা তোমরা খুলতে পারো, কিন্তু আমি আমার ইন্দ্রিয়ের সমস্ত দ্বার রোধ করে এই বসলুম—যদি প্রায়োপবেশনে মরি তবু তোমাদের হাওয়া তোমাদের আলো লেশমাত্র আমাকে স্পর্শ করতে দেব না।

প্রথম যূনক। এই পাগলটা কোথাকার রে। এই তলোয়ারের ডগা দিয়ে ওর মাথার খুলিটা ফাঁক করে দিলে ওর বুদ্ধিতে একটু হাওয়া লাগতে পারে।

মহাপঞ্চক। কীসের ভয় দেখাও আমায়। তোমরা মেরে ফেলতে পারো, তার বেশি ক্ষমতা তোমাদের নেই।

প্রথম যূনক। ঠাকুর, এই লোকটাকে বন্দি করে নিয়ে যাই—আমাদের দেশের লোকের ভারি মজা লাগবে।

দাদাঠাকুর। ওকে বন্দি করবে তোমরা? এমন কী বন্ধন তোমাদের হাতে আছে।

দ্বিতীয় যূনক। ওকে কি কোনো শাস্তিই দেব না?

দাদাঠাকুর। শাস্তি দেবে! ওকে স্পর্শ করতেও পারবে না। ও আজ যেখানে বসেছে সেখানে তোমাদের তলোয়ার পৌঁছায় না।

বালকদলের প্রবেশ

সকলে। তুমি আমাদের গুরু?

দাদাঠাকুর। হাঁ, আমি তোমাদের গুরু।

সকলে। আমরা প্রণাম করি।

দাদাঠাকুর। বৎস, তোমরা মহাজীবন লাভ করো।

প্রথম বালক। ঠাকুর, তুমি আমাদের কী করবে?

দাদাঠাকুর। আমি তোমাদের সঙ্গে খেলব।

সকলে। খেলবে?

দাদাঠাকুর। নইলে তেমাদের গুরু হয়ে সুখ কীসের?

সকলে। কোথায় খেলবে?

দাদাঠাকুর। আমার খেলার মস্ত মাঠ আছে।

প্রথম বালক। মস্ত! এই ঘরের মতো মস্ত?

দাদাঠাকুর। এর চেয়ে অনেক বড়ো।

দ্বিতীয় বালক। এর চেয়েও বড়ো? ওই আঙিনাটার মতো?

দাদাঠাকুর। তার চেয়ে বড়ো।

দ্বিতীয় বালক। তার চেয়ে বড়ো! উঃ কী ভয়ানক!

প্রথম বালক। সেখানে খেলতে গেলে পাপ হবে না?

দাদাঠাকুর। কীসের পাপ?

দ্বিতীয় বালক। খোলা জায়গায় গেলে পাপ হয় না?

দাদাঠাকুর। খোলা জায়গাতেই সব পাপ পালিয়ে যায়।

সকলে। কখন নিয়ে যাবে?

দাদাঠাকুর। এখানকার কাজ শেষ হলেই।

জয়োত্তম। (প্রণাম করিয়া) প্রভু, আমিও যাব।

বিশ্বম্ভর। সঞ্জীব, আর দ্বিধা করলে কেবল সময় নষ্ট হবে। প্রভু, ওই বালকের সঙ্গে আমাদেরও ডেকে নাও।

সঞ্জীব। মহাপঞ্চকদাদা, তুমিও এসো না।

মহাপঞ্চক। না, আমি না।

সুভদ্রের প্রবেশ

সুভদ্র। গুরু!

দাদাঠাকুর। কী বাবা।

সুভদ্র। আমি যে পাপ করেছি তার তো প্রায়শ্চিত্ত শেষ হল না।

দাদাঠাকুর। তার আর কিছু বাকি নেই।

সুভদ্র। বাকি নেই?

দাদাঠাকুর। না আমি সমস্ত চুরমার করে ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছি।

সুভদ্র। একজটা দেবী—

দাদাঠাকুর। একজটা দেবী! উত্তরের দিকের দেয়ালটা ভাঙবামাত্রই একজটা দেবীর সঙ্গে আমাদের এমনি মিল হয়ে গেল যে সে আর কোনো দিন জটা দুলিয়ে কাউকে ভয় দেখাবে না। এখন তাকে দেখলে মনে হবে সে আকাশের আলো—তার সমস্ত জটা আষাঢ়ের নবীন মেঘের মধ্যে জড়িয়ে গিয়েছে।

সুভদ্র। এখন আমি কী করব?

পঞ্চক। এখন তুমি আছ ভাই, আর আমি আছি। দুজনে মিলে কেবলই উত্তর দক্ষিণ পুব-পশ্চিমের সমস্ত দরজা জালনাগুলো খুলে খুলে বেড়াব।

যূনক ও দর্ভকদলের প্রবেশ ও গুরুকে প্রদক্ষিণ করিয়া গান

ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়
তোমারি হউক জয়।
তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হউক জয়।
হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়গ তোমার হাতে,
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে,
বন্ধন হোক ক্ষয়
তোমারি হউক জয়।
এসো দুঃসহ, এসো এসো নির্দয়,
তোমারি হউক জয়।
এসো নির্মল, এসো এসো নির্ভয়,
তোমারি হউক জয়।
প্রভাতসূর্য, এসেছ রুদ্রসাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য বাজে,
অরুণবহ্নি জ্বালাও চিত্তমাঝে
মৃত্যুর হোক লয়।
তোমারি হউক জয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—১৯৪১) : জন্ম কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত *ভারতী* ও *বালক* পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। সংগীত, নাট্যচর্চার ঐতিহ্য ও আবহে তিনি আশৈশব লালিত হয়েছেন। দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিভিন্ন নাটকের প্রয়োজনে তিনি কিশোর বয়স থেকেই সংগীত রচনা, সুরারোপ এবং অভিনয় করেছেন। পরবর্তীকালে তাঁর লেখা নাটকগুলিতেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে গান। তাঁর নাটকগুলির মধ্যে রয়েছে *রাজা, ডাকঘর, ফাল্গুনী, মুক্তধারা, রক্তকরবী, কালের যাত্রা, তাসের দেশ প্রভৃতি*। দীর্ঘ জীবনে তিনি প্রচুর কবিতা, গান, ছোটোগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ লিখেছেন, ছবি এঁকেছেন। এশিয়ার মধ্যে তিনিই প্রথম *নোবেল* পুরস্কার পান ১৯১৩ সালে *Song Offerings* কাব্যগ্রন্থের জন্যে। তাঁর রচিত গান; দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র— ভারত আর বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

প্রসঙ্গত :

‘গুরু’ নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩২৪ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে (ফেব্রুয়ারি ১৯১৮)। গ্রন্থটি প্রকাশ করেন প্রিয়নাথ দাসগুপ্ত ‘ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস’-এর পক্ষ থেকে। গ্রন্থসূচনায় রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন, ‘সহজে অভিনয়যোগ্য করিবার অভিপ্রায়ে অচলায়তন নাটকটি ‘‘গুরু’’ নামে এবং কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত এবং লঘুতর আকারে প্রকাশ করা হইল।’

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ‘অচলায়তন’ নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৩১৯ বঙ্গাব্দে (১৯১২)। ১৩১৮ সালে রবীন্দ্রনাথ নাটকটি পাঠ করে কয়েকজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-বন্ধুকে শোনান। সেই পাঠসভার স্মৃতিচারণে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন (রবিরশ্মি, ২, পৃ. ১৪০) :

‘প্রথমে যেদিন অচলায়তন নাটক পাঠ করেন, সেদিনই উহার নাম ‘‘গুরু’’ রাখিবার ইচ্ছা কবি প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা ‘‘অচলায়তন’’ নামটিকেই অধিক সমর্থন করাতে তাহাই বহাল থাকিয়াছিল।’

‘অচলায়চন’ এবং ‘গুরু’ দুটি নাটকেই পঞ্চক এবং মহাপঞ্চক চরিত্র দুটি আছে। এই চরিত্র দুটি এবং কাহিনিক্রমের ইঙ্গিত সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্রের *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* বইটি থেকে (P-309)। কাহিনিটি সেখানে ছিল এরকম :

A Brahman was one day seated in a very sorrowful mood, with one of his cheeks resting on his palm. An old woman asked him the cause. The Brahman told her his wife was *enciente,* and expected to be delivered soon, and as all his former sons had died immediately after birth, he expected the same calamity soon. The woman said, "Send for me when she is about to be confined, and I will help you." On the day of delivery the old woman came, helped the patient, took the male child in her arms, filled his mouth with butter, covered it with a white cloth, and handing him to a maid-servant, said, "Take this child to the market place, and standing on the crossing, say to every Brahman or Sramana you meet, 'this child salutes you'. When the sun sets bring him back." This was done, and the child lived. He was named Mahapanchaka. A second son was born, and he was saved in the same way. His name was Panchaka. After the death of the Brahman, Mahapanchaka became a hermit, and was soon raised to the rank of an Arhat. Panchaka was a stupid youth and could learn nothing, so his brother expelled him from the monastery, and he sat crying on the roadside. The Lord met him in the condition, directed a hermit to instruct him, and soon after ordained an Arhat.

(এক ব্রাহ্মণ একদিন মনের দুঃখে গালে হাত দিয়ে বসেছিল। কোথা থেকে এক বুড়ি এসে জিজ্ঞেস করল, কেন তোর এত চিন্তা? ব্রাহ্মণ বলল, আমার বউ আঁতুড়ঘরে যাবে, কিন্তু এবারও আমার সন্তান বাঁচবে না। আগে কয়েকবার ছেলে জন্মেই মারা গেছে। বুড়ি বলল, ‘আঁতুড়ে ঢুকলে আমায় খবর দিও। আমি সাহায্য করব।’ ব্রাহ্মণীর যেদিন সন্তান হবে, খবর দেওয়া হল সেই বুড়িকে। নিপুণভাবে সেই বুড়ি দাই-মায়ের ভূমিকা পালন করল, তারপর সদ্যোজাত ছেলেটির মুখে মাখন ঢুকিয়ে সাদা কাপড়ে ঢেকে পরিচারিকার হাতে তুলে বলল, ‘ওকে এবার বাজারচত্বরে নিয়ে যাও, মোড়ে দাঁড়িয়ে কোনো ব্রাহ্মণ বা

শ্রমণ দেখলেই বলবে, ''এই শিশু আপনাকে প্রণাম জানায়'' আর সূর্যাস্তের সময় একে ফিরিয়ে এনো বাড়িতে।' সেরকমই করা হল। শিশুটিও দিব্যি বেঁচে রইল। তার নাম দেওয়া হল মহাপঞ্চক। ব্রাহ্মণের আবার একটি পুত্র হল। একইভাবে তার মৃত্যুকে রুখে দেওয়া গেল। এই ছেলেটির নাম হল পঞ্চক। ব্রাহ্মণের আয়ু শেষ হল। মহাপঞ্চক কালে কালে হল এক সন্ন্যাসী, ক্রমে উন্নীত হল অর্হৎ পর্যায়ে। পঞ্চক হয়ে রইল এক নির্বোধ যুবক, যে কিছুই শিখতে পারল না। তখন মহাপঞ্চক তাকে বৌদ্ধমন্দির থেকে তাড়িয়ে দিল। পঞ্চক রাস্তার ধারে বসে কান্নাকাটি করছিল এমন সময় প্রভু তাকে দেখে এক সন্ন্যাসীকে দায়িত্ব দেন পঞ্চককে। পঞ্চক সেই সাধনায় ক্রমে অর্হৎ হয়ে ওঠে।)

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'রবীন্দ্র রচনাবলি' (ষোড়শ খণ্ড), গ্রন্থপরিচয় অংশে বলা হয়েছে :

'অচলায়তন' ছিল ৬ দৃশ্যের নাটক, 'গুরু'তে দৃশ্যসংখ্যা ৪। 'অচলায়তন'-এ গানের সংখ্যা ২৩, 'গুরু'তে ৭। এই ৭টি গানের মধ্যে 'ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়' নতুন সংযোজন। বাকি ৬টি 'অচলায়তন'-এ ছিল, যদিও একই পারম্পর্যে নয়। আর 'অচলায়তন'-এর এই গানগুলি বর্জিত হয়েছে 'গুরু'তে : দূরে কোথায়; কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে; ঘরেতে ভ্রমর এল; এই একলা মোদের দাদাঠাকুর; যা হবার তা হবে; আমি কারে ডাকি গো; বুঝি এল; আজ যেমন করে গাইছে আকাশ; হারে, রে রে রে রে; এই মৌমাছিদের; আমরা তারেই জানি; সকল জনম ভ'রে; উতল ধারা বাদল ঝরে; আলো আমার আলো; যিনি সকল কাজের কাজি; আমি যে সব নিতে চাই; আর নহে আর নয়।

'সহজে অভিনয়যোগ্য' করবার উদ্দেশ্যে পরিবর্তিত হলেও নাটকের এই রূপটি শান্তিনিকেতনে সচরাচর অভিনীত হত না বলেই ব্যক্তিগত সাক্ষ্যে জানিয়েছিলেন প্রমথনাথ বিশী। যদিও, 'অচলায়তন' কেটে 'গুরু'র যে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়েছিল (Ms 230) সেখানেই রবীন্দ্রনাথ সম্ভাব্য অভিনেতাদের নামের একটা তালিকা সাজাচ্ছিলেন। পৃষ্ঠার ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত এলোমেলোভাবে ছড়ানো সেই পরিকল্পনা ছিল এইরকম :

পঞ্চক	আমি
মহাপঞ্চক	অবন
আচার্য	গগন/রথী
উপাধ্যায়	অসিত
গুরু	গগন
সুভদ্র	নেপু কিংবা গবা কিংবা খুকি
উপাচার্য	মণিলাল

হিরণ্ময় সমর নবু অজিত যামিনীর ছেলে সুকুমার প্রশান্ত ছোটকু খোদন

এরকম কোনো অভিনয় অবশ্য হতে পারেনি।

প্রায় দশ বছর পরে, প্রভাতকুমারের বর্ণনা অনুযায়ী ('রবীন্দ্রজীবনী' ৩, পৃ. ৩৬৩), ১৯২৮ সালের পূজাবকাশের আগে 'গুরু' নাটকটিই 'ছাত্র-শিক্ষকে মিলিয়া সিংহসদনে অভিনয় করিলেন, সেখানে তাঁহার (রবীন্দ্রনাথের) প্রেরণা আছে — অভিনয়েও উপস্থিত হইয়া সকলের আনন্দবর্ধন করেন।'

পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যসূচি

বাংলা - ক পাঠক্রমের পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যসূচি

গল্প

১.	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	......	দুর্বুদ্ধি, বিদূষক, কর্তার ভূত
২.	প্রেমেন্দ্র মিত্র	......	তেলেনাপোতা আবিষ্কার
৩.	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	......	কে বাঁচায়, কে বাঁচে
৪.	তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়	......	স্বাধীনতা
৫.	আশাপূর্ণা দেবী	......	ত্রাণকর্তা
৬.	পরশুরাম	......	পরশপাথর
৭.	সতীনাথ ভাদুড়ী	......	ডাকাতের মা
৮.	বনফুল	......	বন্য মহিষ
৯.	মহাশ্বেতা দেবী	......	ভাত
১০.	সমরেশ বসু	......	পশারিণী
১১.	সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ	......	ভারতবর্ষ
১২.	মতি নন্দী	......	অস্থায়ী পলায়ন
১৩.	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	......	লেখিকা
১৪.	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	......	শাজাহান আর তার নিজস্ব বাহিনী
১৫.	শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়	......	সম্পূর্ণতা

প্রবন্ধ

১.	হুতোম প্যাঁচা	......	ভূত নাবানো
২.	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	......	কমলাকান্তের জোবানবন্দী
৩.	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	......	কৌতুকহাস্য, নবযুগ, বিদ্যার যাচাই, সভ্যতার সংকট
৪.	সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	......	জগতের শ্রেষ্ঠ বই
৫.	আব্দুল জব্বার	......	ধানের নাম লক্ষ্মী
৬.	সত্যেন্দ্রনাথ বসু	......	গালিলিও
৭.	অশীন দাশগুপ্ত	......	রবি ঠাকুরের দল/সহিষ্ণুতার ইতিহাস
৮.	সৈয়দ মুজতবা আলি	......	নেতাজী

৯.	কল্যাণী দত্ত	......	আম
১০.	কাজী নজরুল ইসলাম	......	ক্ষুদিরামের মা
১১.	নবনীতা দেবসেন	......	দামাস্কাসের গেট (অংশ)
১২.	স্বামী বিবেকানন্দ	......	সুয়েজখালে : হাঙর শিকার
১৩.	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	......	ঘরোয়া (অংশ)
১৪.	প্রমথ চৌধুরী	......	সুরের কথা
১৫.	বিনয় ঘোষ	......	হাসি
১৬.	শান্তিদেব ঘোষ	......	বাংলাদেশের যাত্রাভিনয়

ভারতীয় গল্প

১.	কর্তার সিংহ দুগ্‌গাল	......	অলৌকিক
২.	ইসমত চুগতাই	......	বাচ্চা

আন্তর্জাতিক গল্প

১.	গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ	......	বিশাল ডানাওয়ালা এক থুরথুরে বুড়ো
২.	আন্তন চেকভ	......	কেরানির মৃত্যু

কবিতা

১.	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	......	বীরাঙ্গনা, সনেট (বটবৃক্ষ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)
২.	লালন ফকির	......	বাড়ির কাছে আরশিনগর
৩.	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	......	রূপনারানের কূলে/আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে/ প্রাণ/ ঝড়ের খেয়া/ আধোজাগা
৪.	কাজী নজরুল ইসলাম	......	বিদ্রোহীর বাণী, অরুনকান্তি কে গো, দ্বীপান্তরের বন্দিনী
৫.	জীবনানন্দ দাশ	......	শিকার, তিমির হননের গান, আলোপৃথিবী
৬.	অমিয় চক্রবর্তী	......	বিনিময়
৭.	বিষ্ণু দে	......	স্বহস্তে বাজাবে
৮.	বুদ্ধদেব বসু	......	বাবার চিঠি
৯.	সমর সেন	......	মহুয়ার দেশ
১০.	সুভাষ মুখোপাধ্যায়	......	আমরা যাবো, পারাপার
১১.	নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	......	দেশ দেখাচ্ছ অন্ধকারে

১২.	অরুণ মিত্র	......	তোমার মূর্তি আমি
১৩.	শঙ্খ ঘোষ	......	দ
১৪.	অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত	......	নির্বাসন
১৫.	শক্তি চট্টোপাধ্যায়	......	আমি দেখি
১৬.	ভাস্কর চক্রবর্তী	......	জিরাফ
১৭.	মৃদুল দাশগুপ্ত	......	ক্রন্দনরতা জননীর পাশে
১৮.	জয় গোস্বামী	......	নুন
১৯.	মল্লিকা সেনগুপ্ত	......	সাম্প্রদায়িক
২০.	সুকান্ত ভট্টাচার্য	......	প্রিয়তমাসু

ভারতীয় কবিতা

১.	আইয়াপ্পা পানিকর	......	শিক্ষার সার্কাস
২.	মোহন ঠাকুরা	......	ঈশ্বরের খোঁজে

আন্তর্জাতিক কবিতা

১.	বের্টোল্ট ব্রেখট	......	পড়তে জানে এমন এক মজুরের প্রশ্ন
২.	ওয়ালট হুইটম্যান	......	ঘাস

পূর্ণাঙ্গ বই

১.	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	......	গুরু
২.	সুভাষ মুখোপাধ্যায়	......	আমার বাংলা

নাটক

১.	বিজন ভট্টাচার্য	......	আগুন
২.	শম্ভু মিত্র	......	বিভাব
৩.	অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়	......	নানা রঙের দিন
৪.	উৎপল দত্ত	......	ইতিহাসের কাঠগড়ায়
৫.	বাদল সরকার	......	ভুল রাস্তা
৬.	মনোজ মিত্র	......	মঞ্চে চিত্রে
৭.	মোহিত চট্টোপাধ্যায়	......	মাছি